একূল ওকূল
নরেন্দ্রনাথ মিত্র

দোল পূর্ণিমা—১৩৬৩

প্রকাশনায়
শ্রীঅনিতা ঘোষ
প্রচারিকা
৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুখেন গুপ্ত

মুদ্রাকর
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা ৭

পরিবেশক
ঘোষ ব্রাদার্স এণ্ড কোং
৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা ৯

আড়াই টাকা

শ্রীমুরলীধর বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

একূল ওকূল

॥ রাজধানী ॥

অস্থায়ী চাকরি। দু'দফা ছাঁটাই আগেই হয়ে গেছে। তৃতীয় দফায় রমেন যে নির্ঘাৎ পড়ে যাবে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ ছিল না। মরীয়া হয়ে রমেনও ভেবেছিল যায় যদি যাক। চাকরি যায় যায় করছে তো সেই অফিসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গেই। এমন ত্রিশঙ্কুর মত থেকে আর লাভ নেই।

খেতে বসতে শুতে স্ত্রী নীলিমাও কম আশ্বাস আর সান্ত্বনা দিচ্ছিল না, 'অত ভাববার কি হয়েছে। ভু-ভারতে তোমার ওই অফিস ছাড়া আর কি কোন অফিস নেই নাকি? কোথাও না কোথাও চাকরি একটা জুটবেই। আর যদি নাই জোটে—'নীলিমা ফিক করে হেসেছিল, 'বরং না জোটাই ভালো। তা হ'লেই আমি একটা চান্‌স্ পাব। তুমি কিছুদিন বিশ্রাম করবে, ঘর আগলাবে, আমি বাইরে বেরোতে পারব। দেখো, তোমার মত অত চাকরি খুঁজে হয়রান হবনা আমি।' রমেন অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'তা তো ঠিকই চাকরি তুমি কেন খুঁজবে। বরং চাকরিই খুঁজতে আসবে তোমাকে, একবার একটু সাড়া পেলে হয়।'

ম্যাট্রিক পাশকরা স্ত্রীকে রমেন ঘরে বসে পড়িয়ে পড়িয়ে বি, এ, পাশ করিয়েছে। কিন্তু চাকরি করতে দেয়নি। বলেছে, 'আমার বিদ্যাটাই প্রয়োজনে লাগুক, তোমার বিদ্যাটা ভূষণ হয়ে থাক। বিদ্যা আছে বলেই যে তা বিক্রি করতে বেরোতে হবে, এমন কি কথা আছে।'

নীলিমা মুখ ভার করেছে, কথা কাটাকাটি করেছে কিন্তু তার বেশি কিছু করতে পারেনি। স্বামীর সম্ভ্রম বোধে আঘাত দিতে পারেনি সে। রমেনের আয় পর্যাপ্ত নয় ব'লে নানা ভাবে ব্যয় সংকোচের অভ্যাস ক'রেছে তবু নিজে উপার্জনে নামতে পারেনি। চাকরি অবশ্য

রমেনের শেষ পর্যন্ত গেল না তবে যাওয়ার বাড়া হোল। দলবল নিয়ে গোটা অফিসটাই উঠে গেল দিল্লীতে। নানা বিরক্তি আর অসন্তুষ্টি জানিয়েও শেষ পর্যন্ত রমেনের সহকর্ম্মী বন্ধুর দল যাওয়াই ঠিক করল। বলল, 'এই সুযোগে রাজধানীটা তো অন্তত দেখে আসা যাক।'

কেরানীদের জন্য পাইকারী ভাবে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে সস্ত্রীক নয়। 'ব্যাচিলরস্ ডেন' যারা অপত্নীক কি বিপত্নীক তাদের তো কোন হাঙ্গামাই নেই, আর যারা পত্নীবান তাদের শাস্ত্রের অনুশাসন আছে, 'পথি নারী বিবর্জিতা।'

জানাশোনার মধ্যে একে একে চলল সবাই। স্ত্রীকে কেউ পাঠান শ্বশুর বাড়ি, কেউ রাখল বড় ভাই কি বাপমায়ের হেপাজতে। এমন কি তিনটি ছেলেমেয়ের বাপ বিভূতি পর্যন্ত গমনোদ্যত হয়ে বলল, 'াক হে মুখার্জী, আঁচলে জড়াল বুঝি পা। মন মোর চলে কি না চলে।'

রমেন হিসাব ক'রে দেখল না যাওয়ার কোন মানে হয় না। মিছামিছি চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে লাভ কি। ছেড়ে দিলেও ছেড়ে দিয়ে থাকা তো আর যাবে না। আবার একটা খুঁজে পেতে সেই বার করতেই হবে। সেই ছুটোছুটি, সুপারিশ সংগ্রহ আর ইণ্টারভিউ। উদ্যোগ পর্বেই প্রানান্ত। তার চেয়ে যা আছে তাই ভালো। নীলিমাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে দেশের বাড়িতে। সেখানে মায়ের সেবা শুশ্রূষা চলবে, ছোট ভাই বোনগুলির একটু যত্ন নিতে পারবে নালিমা। আর এই সুযোগে সত্যিই একটু ঘুরে টুরে বেড়াতে পারবে রমেন। চাকরির কাঁধে ভর ক'রে দেখে নেবে একবার দেশটা। কবে আবার সুযোগ সুবিধা ঘটবে তার তো কিছু ঠিক নেই। বরং না ঘটবারই সম্ভাবনা। দুদিন যেতে না যেতেই আবার চাকরির জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। সংসার বড় হবে, দায়িত্ব বাড়তে থাকবে, ছোট ভাইটি ক্লাশের পর ক্লাশ ডিঙিয়ে যাচ্ছে, খরচ বাড়ছে তার পড়াশুনার, বোনটি বিয়ের বয়স ছুঁই ছুঁই করছে। এর পর কি আর দম ফেলবারও সময় মিলবে রমেনের।

বাসায় এসে স্ত্রীকে রমেন সব বলল। সব মানে যতটুকু বলা যায়, যে ভাবে বললে খুসি হ'তে পারে নীলিমা। দিল্লী তো এমন কিছু দূর নয়, ছুটিছাটায় রমেন তো আসবেই। আর কেবল রমেনের আসাই বা কেন, নীলিমাও তো একদিন যাবে। তারপরে দুজনে মিলে দেখবে দেশ, দেখবে গোটা ভারতবর্ষকে। সমস্ত পৃথিবীটাই যখন মানুষের হাতের মুঠোর মধ্যে গিয়েছে, তখনো কেবল এই কলকাতা আর বিরামপুর ছাড়া কিছু চিনল না রমেন আর নীলিমা, তখনো বহির্বাংলা তাদের কাছে গ্রহান্তর, লোকান্তরের সমান। একি কম দুঃখের, কম আপশোষের কথা। নীলিমা খুসি হয়ে একবার অনুমতি দিক রমেনকে।

কিন্তু নীলিমার মুখ ভার হোল, চোখ উঠল ছল ছল ক'রে। বল্‌ল, 'তার দরকার কি, আমি যাই দেশের বিরামপুরের বাড়িতে, তুমি এখানে কোন একটা মেসে হোটেলে থেকে অন্য চাকরি খুঁজে নাও। আমি তো বলছিনা যে বাসা করেই থাকতে হবে, সারা বছর কাছে কাছেই রাখতে হবে আমাকে। কিন্তু দিল্লী তোমাকে আমি কিছুতেই যেতে দিতে পারব না।'

রমেন বিব্রত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'তাতে লাভটা কি হবে। একবার চোখের আড়ালেই যদি গেলাম, যেখানেই যাই না, কলকাতাই হোক, দিল্লীই হোক, আর মেসোপটেমিয়াই হোক, তোমার কাছে তো সেই একই কথা।'

নীলিমা মাথা নেড়ে বলল, 'না একই কথা নয়। কলকাতায় থাকলে তবু মনে মনে ভাবতে পারব আমার চেনা জায়গায়, আমার দেখা জায়গায় রয়েছ। আমি যদিও আর থাকবনা তবু একদিন তো ছিলাম একথা তুমি ভুলতে পারবেনা।' রমেন বলল, 'আর সেখানে গেলেই বুঝি ভুলব?' নীলিমা বলল, 'তাছাড়া কি! এখানে বাসা ছেড়ে দিলেও রোজ তুমি অফিসের পর একবার এই বাসার কাছ দিয়ে ঘুরে যাবে, আর মনে পড়বে আমার কথা। আমিও মনে মনে ভাবতে পারব, দিনের কোন সময় কোথায় তুমি আছ। চিঠিপত্রে কোন রাস্তার নাম করলে কোন

সিনেমার নাম করলে, আমি চ করে ধরে ফেলতে পারব, মনে মনে ভেবে নেব আমি তোমার সঙ্গেই ছিলাম, সঙ্গেই আছি। কিন্তু দিল্লীতে গেলে তো আর তা হবে না। সম্পূর্ণ অচেনা অজানা জায়গা। সেখানে তুমি আমাকে একেবারেই ভুলে যাবে।'

রমেন স্ত্রীর দিকে একবার তাকাল। মাথার আঁচল খুলে পড়েছে। পিঠ ভরে ছড়িয়ে পড়েছে চুলের রাশ। আয়ত ঘন কালো দুটি চোখে জল এসে পড়ল বলে, রক্তিম পাতলা ঠোঁট দুটির কম্পন এখনো যেন অনুভব করা যায়।

রমেন বলল, 'ভুলে যাওয়া কি এতই সহজ।' নীলিমা জবাব দিল 'তোমাদের কাছে সহজ ছাড়া কি। তোমাদের হৃদয়টাই কেবল কঠিন। আর কিছু তোমাদের কাছে কঠিন নয়।'

মনটা কেমন করে উঠল রমেনের। কিন্তু চাকরি ছাড়াটা যুক্তিযুক্ত হবে না। আর বাইরে বেরোবার সুযোগটাও কি হাত ছাড়া করা ঠিক। সুতরাং আরো দুদিন ধরে চলল বুঝানো সুজানোর পালা। তারপর নীলিমাকে নিয়ে চাপল ট্রেনে, গাঁয়ের বাড়িতে তাকে রেখে আসবার জন্য।

মধ্যম শ্রেণীর ভিড়ের মধ্যেও কোন ক্রমে একটু জায়গা করে নিয়ে পাশা পাশি বসল দুজনে। নীলিমার হাতখানা নিজের মুঠির ভিতর নিয়ে একটু চাপ দিয়ে রমেন বলল, 'এ কিন্তু কেবল জার্নির অর্ধাংশ। কিছুকাল বাদে দুজনে মিলে এমনি একদিন যখন পশ্চিমের ট্রেনে উঠব, যাত্রাটা সেদিন পুরোপুরি হবে। বিরামপুরটা তো আসলে ডেষ্টিনেশন নয়, মাঝপথের ষ্টেশন মাত্র, বুঝেছ?' নীলিমা ঘাড় নেড়ে ম্লান একটু হাসল, কোন কথা বলল না।

তৈরী হওয়ার জন্য মাত্র সপ্তাহ খানেকের ছুটি মিলেছে রমেনের। বাড়ি এসে দুদিন থাকতে না থাকতেই ফের যাত্রার আয়োজন শুরু হল। ছোট ভাই বোন দুটি উল্লসিত হয়ে উঠল। সোজা কথা নয়। তাদের দাদা দিল্লী যাচ্ছে চাকরি করতে। ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লী। সেখানে গিয়ে অফিস করবে তাদের দাদা। আশে পাশের

পনের বিশ খানা গাঁয়ের মধ্যে কেউ বের করুক তো এমন আর একজন লোক যে দিল্লী যাচ্ছে, কি দিল্লী যাওয়ার মত যার সাধ্য আছে, বিদ্যা বুদ্ধি আছে অতখানি।

ছোট ভাই নান্তু বলল, 'দাদা, আমাকে একবার নিয়ে যাবে তো বেড়াতে ?'

রমেন বলল, 'নিশ্চয়ই, সবাইকেই নেব।' নান্তু বলল, 'আর কাউকে নাও না নাও আমাকে কিন্তু নিতেই হবে। এ ক্লাশটা শেষ হলেই সেকেণ্ড ক্লাশ আমি দিল্লী গিয়ে আরম্ভ করব। রমেন হেসে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে।'

মা গলার স্বর ভারি করে বললেন, 'কিন্তু আমার যেন মন সরছেনা। বাড়ি থেকে একেবারে অত দূরে গিয়ে থাকবি খোকা। কলকাতা তবু কাছে পিঠে ছিল, কিন্তু দিল্লী—?'

রমেনের হয়ে নান্তুই ধমক দিয়ে উঠল মাকে, 'দিল্লী তাই কি! খুব বুঝি দূরের জায়গা ভবেছ। আচ্ছা দাঁড়াও, ম্যাপে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি জায়গাটা।' বলতে, বলতে এ্যাটলাসটা নিয়ে এল নান্তু। ভারতবর্ষের মানচিত্র খুলে দিল্লী শহরের অবস্থানটা দেখিয়ে দিল মাকে।

একটু নির্জনে স্ত্রীকে পেয়ে, রমেন মুচকি হেসে বলল, 'ম্যাপটা ওর কাছ থেকে এনে তুমিও মাঝে মাঝে দেখো। মনে ভরসা পাবে। বুঝতে পারবে জায়গাটা আর যাই হোক পৃথিবীর বাইরে নয়।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আমার দেখা শোনা ধরা ছোঁয়ারতো বাইরে। তোমার চোখের আড়ালে তো পড়ে রইলাম আমি। এর পর মনের আড়াল পড়তে আর কতক্ষণ, পুরুষেরতো মন।'

রমেন বলল, 'কিছু ভেবনা, সে মন সম্পূর্ণভাবে তোমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেলাম।'

তবু যাওয়ার সময় নীলিমার বিষণ্ন ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে রমেনের বুকের ভিতরটা যে একবার মোচড় দিয়ে না উঠল তা নয়। স্ত্রীর ভিজে চোখের দিকে চেয়ে নিজের চোখ দুটোও যেন রমেনের

একটু ছল ছল করে উঠল। চোখের জলটা সংক্রামক ; বিশেষ ক'রে ছোঁয়াছুঁয়ির মাত্রা যেখানে হৃদয় পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে।

রমেন চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগাছার জঙ্গলে আর বাঁশঝাঁড়ে ঘেরা পাড়াগাঁয়ের বাড়িখানাকে একেবারেই অন্ধকার বলে মনে হোল নীলিমার। চোখ ফেটে জল আসতে লাগল, এখানে সে টিকবে কি করে, দিন কাটবে এখানে তার ?

বিয়ের পর খুব বেশি দিন থাকতে হয়নি এখানে। বাপমায়ের একমাত্র আদুরে মেয়ে বলে সব মিলিয়ে তিনচার মাসের বেশি এই গাঁয়ের শ্বশুর বাড়িতে তার কাটেনি। কলকাতায় বাপের বাসায় আর স্বামীর বাসায় ভাগাভাগি হয়েই ছিল এই তিন চারটা বছর। রমেন দিল্লীতে বদলী হবে শুনে এবারো নীলিমার বাবা তাকে নিজে বাসায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা স্বামীরও মনঃপূত হয়নি, শাশুড়ীরও নয়। বাপের বাড়ি না হয় এরপরে আসবে নীলিমা, এখন কিছুকাল শ্বশুর ঘর করুক। বুড়ী শ্বাশুড়ী। তাঁরও তো মনের সাধ আহ্লাদ দেহের ভালো লাগা মন্দ লাগা আছে। রমেনের ছোট ভাই বোনেরও তো একটু বউদির সঙ্গে আমোদ ফুর্তি করতে ইচ্ছা করে।

সে কথা সত্য। শ্বাশুড়ী, দেবর, ননদ সবাই চারদিকে ঘিরে ধরেছে নীলিমাকে। স্নেহ ভালবাসা আদর যত্নের ক্রুটি নেই একটুও। তবু ভালো লাগে না, তবু যেন দম আটকে আসতে চায় নীলিমার। মনটা খাঁ খাঁ করতে থাকে। মনে পড়ে কলিকাতা, আর কলিকাতার সেই যৌথ জীবন যাপন। সেখানে রোজ আসত নতুন নতুন দিন। নিত্য নতুন আদর নিত্য নতুন সোহাগের ভিতর দিয়ে ভোর হোত রাত। এখানে একদিনের চেহারার সঙ্গে আর এক দিনের চেহারা অবিকল মলে যায়। এখানে দিন-যাপন নয়, কেবল দিন-গুজরান। দিনগুলিকে কেবল দুহাতে ঠেলে ঠেলে দেওয়া। কেবল প্রতীক্ষা ক'রে থাকা রমেনের নয়, রমেনের চিঠির। কিন্তু কেবল শূন্যতা আর নিঃসঙ্গতাই নয়, অস্তিত্বকে দুঃসহ করে তুলতে আরো কিছু কিছু উৎপাত জুটল। চার পাশের প্রতিবেশীরা এলো ভিড় করে। গৃহিনীরা এসে শ্লেষ করে

বলতে লাগলেন,' বি, এ, পাশ বৌ কি রকম ভাত রাধে রমুর মা ? কোন নতুন কায়দা কানুন করে নাকি ।'

রমেনের মা একেকদিন ঝাঁঝালো স্বরেই জবাব দেন, 'তা এসে একদিন খেয়ে দেখলেই পারো বকুর জেঠী ।'

কিন্তু মন যেদিন খারাপ থাকে, কোন কারণে সামান্য একটু কথান্তর যদি হয় কোনদিন, তখন সেই শ্বাশুড়ীই বকুর জেঠী, তিনুর মা, বিনুর পিসিদের কাছে ফলাও ক'রে বি, এ, পাশ বউয়ের মাহিমা কীর্তনে লেগে যান ।

সরকারদের বীণা নিজের বৌদি সুলতার সঙ্গে বেড়াতে এসে বলে 'বি, এ, পাশ বৌদি দেখতে এলাম আমরা ।' বি, এ, পাশ কথাটির মধ্যে খোঁচা থাকে । তবু নীলিমা সহাস্যেই জবাব দেয়, 'বেশ তো দেখুন ।'

বীণা বলে, 'নাঃ, ভারি নিরাশ করলেন বৌদি । এসে দেখছি সেই আমাদের মত দুটো করেই চোখ, দুটো কান একটা নাক, নতুন বোশ কিছু গজিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না ।'

তার কথার ভঙ্গিতে রমেনের বোন উমা পর্যন্ত মুখে আঁচল চেপে হাসে । বৌদির দুর্দশায় সে কিছুমাত্র বিচলিত হয়েছে বলে মনে হয় না । পরীক্ষা পাশ দিয়ে বউদি যেন অনেক দূরের মানুষ হয়ে পড়েছে । তার জন্য গর্ব করা যায় প্রতিবেশীর কাছে কিন্তু একান্ত আপন জন বলে নিজের কাছে তাকে টেনে নেওয়া যায় না ।

বীণার বউদি সুলতাও মুখ টিপে টিপে হাসে । বলে 'তাইতো, পাশ করে এসেও আমাদের মত এই জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে রইলেন । বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, রান্না আর জল টানা ছাড়া কিচ্ছু করলেন না । এ যেন কেমন কেমন লাগে ।'

নীলিমার বুকের ভিতরটা কোথায় যেন জ্বালা ক'রে ওঠে । কিন্তু তেমনি মুখে হাসি টেনে জবাব দেয়, 'কেন পাশ ক'রে এলে কি মানুষের ক্ষুধাতৃষ্ণা, ঘর সংসার সব লোপ পায় ?'

বীণা বলে, 'তা কি আর পায় । তবু পাশ করা না করার মধ্যে একটা পার্থক্য তো আছে । তাতো কিছু আমরা দেখতে পারছি না ।'

একটু চুপ করে থেকে বীণা আবার হাসে, 'ভট্টচার্য বাড়ির বিশুদা কি বলে জানেন ?'

নীলিমা ঘাড় নাড়ে, 'না।'

বিশুদা বলে, 'ওসব পাশ টাশ মিছে কথা। রমেনদার একটা চাল। পাছে আমরা একটু কাছে ঘেষি তার বউয়ের সেই ভয়ে স্ত্রীর চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে গেছে রমেনদা।'

বিশু কলেজে বছর চারেক পড়েছিল। দু'বারই আই, এ, ফেল করেছে।

বীণার কথায় উমার পারিবারিক সম্মানে আঘাত লাগে। মুখিয়ে ওঠে বীণার ওপর, 'ঈস্, মিছে কথা বললেই হোল ? সার্টিফিকেট আছেনা বউদির ? বৌদি, দাওনা তোমার চাবির রিঙটা। ট্রাঙ্ক থেকে বের করে দেখাই সার্টিফিকেট।'

বীণা বলে, 'আমাদের দেখিয়ে আর লাভ কি। আমরা তো আর ইংরাজী পড়তে পারব না।'

উমা ঝাঁজালো কণ্ঠে জবাব দেয়, 'তবে তোমার সেই বিশুদাকেই আসতে বলো বীণা দি। সেই এসে পড়ে যাবে।'

বীণারা চলে যাওয়ার পরও বহুক্ষণ নীলিমার মনটা বিষন্ন আর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। দিনের পর দিন এদের মধ্যেই এমনি করে বাঁচতে হবে তাকে। এক হিসাবে ওরা সত্যি কথাই বলেছে। পড়াশুনা করাটা তার পক্ষে নিতান্তই বোকামি হয়ে গেছে। এমন করেই যদি দিন কাটাবে সে ঠিক করেছে তাহলে কেন সে পড়াশুনা করতে গেল, কেন গেল পরীক্ষা দিতে। তখন সোৎসাহে নোট মুখস্ত করে করে পরীক্ষার পর পরীক্ষা দিয়ে গেছে। কিন্তু স্বপ্নেও কি নীলিমা ভেবেছিল সেই তৃপ্তি, সেই গর্ব পরবর্তী জীবন যাত্রায় বাধা হয়ে দাঁড়াবে। কি দিয়েছে তাকে এই বিদ্যা ? নিজের পায়ে ভর করে দাঁড়াবার মত দৃঢ়তা দেয়নি, দেয়নি প্রতিকূল পারিপার্শ্বিককে জয় করবার মত শক্তি, শুধু একটা দুঃসহ অসন্তোষ আর অতৃপ্তি এনে দিয়েছে মনের মধ্যে। শুধু মনে করতে শিখিয়েছে যেখানে সে আছে সে স্থান তার যোগ্য নয়, যে

পদ্ধতিতে সে দিন কাটাচ্ছে তা হাস্যকর তার বেশি কিছু শিখায়নি। কেবল অনুতাপ আর অনুশোচনা, ক্ষোভ আর অসন্তোষে বিদ্যা তার অঙ্গে কণ্টকের অলঙ্কার হয়ে রয়েছে ; গর্বের, আনন্দের, কল্যাণের সামগ্রী হতে পারেনি।

চিঠি আসে রমেনের। বেশ ঘন ঘন বড় বড় চিঠি। সহর আর সহরবাসীদের বর্ণনায় পাতা ভরে ওঠে! বিচ্ছেদের কাতরতায় পাতা ছাপিয়ে যায়।

রমেন লেখে 'কিন্তু মনে মনে তোমার বোধ হয় খুব হিংসা হচ্ছে, ভাবছ রাজধানীতে এসে একেবারে রাজার হালে রয়েছি। তাই থাকতাম যদি রাণী থাকতেন সঙ্গে। কিন্তু এ যে রাণীহীন রাজধানী। অফিস সারাদিন আছে কিন্তু সারা রাত ফিস ফিস নেই। ওয়েসিসহীন মরুভূমি। কতদিন সহ্য হয় এ দশা। প্রাণপণ চেষ্টা করছি একটি বাসার জন্য। যেমন করেই হোক তোমাকে দিল্লী বাসিনী করবই।'

নীলিমা জবাব দেয়, 'তাই করো, এখানে আমি আর টিকতে পারছিনা।'

এই নিঃসহায় নির্ভরশীলতা ভারি ভালো লাগে রমেনের। চাকরিতে যা আয় তাতে এই সহরে বাসা করে থাকবার মত অবস্থা নয়। তা ছাড়া বাসা পাওয়াই যায় বা কোথায়। রমেন দিনের একটা ভাগ আয় বাড়াবার চেষ্টা করে। প্রবন্ধ লেখে খবরের কাগজে। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে শাঁসালো টিউশানি পাওয়া যায় কি না খুঁজে বেড়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে করে বাসার খোঁজ। কিন্তু পরিচিত আধা পরিচিতের দল মাথা নাড়ে, 'ঘরনী যদি চান দু'চারজন দিতে পারি কিন্তু ঘর? ও কথা আর বলবেন না।'

তবু রমেনের চেষ্টার বিরাম নেই। যেমন করেই হোক ডেরা একটা সে এখানে খুঁজে বের করবেই। নীলিমাকে আর ওই জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রাখা যায় না। শিক্ষিত উচ্চতর সমাজে তাকে এবার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। প্রমাণ করতে দিতে হবে তাকে সামান্য কেরাণীর স্ত্রী হলেও বিদ্যায় বুদ্ধিতে সে সামান্য নয়। তবেই এত

পরিশ্রম সার্থক হবে রমেনের। সার্থক হবে অফিসের খাটুনির পরও রাত জেগে জেগে তাকে পড়ানো, ভালো খাওয়া ভালো পরা থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে সেই ঐকান্তিক বিদ্যোৎসাহিতার ফল মিলবে তখন।

নীলিমার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও প্রায় স্বামীর অনুরূপ। রমেনের চিঠিপত্রে দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চল আর বিভিন্ন রাস্তার নাম তার মুখস্ত হয়ে গেছে। সেখানকার ধরন ধারন আদবকায়দা, রমেনের বন্ধুবান্ধবদের নাম ধাম তাদের পদমর্যাদা কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে, মনে মনে সব ঠিক করে নিয়েছে নীলিমা। কিছুই তার আর জানতে বুঝতে বাকী নেই। এখন কেবল খান দুয়েক ঘর পেলেই হোল। তাই নিয়ে চিঠিতে চিঠিতে জল্পনা কল্পনা চলে। তুলনামূলক আলোচনা চলে কলকাতার সঙ্গে দিল্লার। কলকাতায় যে পদ্ধতিতে যে ধরনের আসবাব-পত্রে ঘর বোঝাই করেছিল রমেন, এবার তা চলবে না। এবার সব ভার থাকবে নীলিমার ওপর। নিজের পছন্দ মত জিনিস পত্র কিনবে নীলিমা, ঘর সাজাবে নিজের রুচি অনুযায়ী। রমেন জবাব দেয় তাতে তার আপত্তি নেই। ঘর নিজের রুচি মাফিকই সাজাক নীলিমা, কিন্তু নিজে সাজবার বেলায় যেন রমেনের রুচিকে একটু প্রশ্রয় দেয়।

দিল্লীর বাসার কথা ভাবতে ভাবতে এখানকার ঘরদোরের দিকে নীলিমার বিশেষ লক্ষ্য ছিলনা। কোন রকমে কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলেই হোল। কিন্তু এমন নোংরা আর অপরিচ্ছন্ন হয়েছে নীলিমার ঘরখানা যে কটা দিন তো ভালো, একটা মুহূর্তও আর কাটতে চায় না। কালি ঝুলে ঘর ভরে গেছে। তক্তাপোষ খানার এক পাশে ছেঁড়া আর পুরান এক রাজ্যের বই। পড়াশুনোর দিকে তো কারো তেমন লক্ষ্য নেই কিন্তু এ বাড়িতে এত বই এল কোত্থেকে। এ ঘরে বই, ও ঘরে বই, তাক ভরে ভরে বইয়ের পাঁজা। নীলিমার শ্বশুরের নাকি ভারি সখ ছিল বই কিনবার আর বই পড়বার! কলকাতায় গেলেই পুরোন দোকান থেকে ফুটপাত থেকে ওজন দরে সব বই কিনে আনতেন বস্তা ভরে। রোগটা রমেনকেও পেয়েছে। বই

কিনতে পারলে আর কিছু চায়না। দিল্লী যাওয়ার সময়ও বই বোঝাই দু'তিনটে বাক্স সে বাড়িতে রেখে গেছে।

নীলিমা নান্তুকে ডেকে বলল, 'বইগুলি এক জায়গায় গুছিয়ে রাখলেই তো হয়।'

অতটুকু ছেলেকে ঠাকুরপো বলতে নীলিমার লজ্জা করে কিন্তু নাম ধরে ডাকলেও নান্তু ভয়ঙ্কর চটে যায়।

নান্তু বলল, 'বেশ তো রাখোনা গুছিয়ে।'

নীলিমা খানিকটা তোষামোদের সুরে বলল, 'লক্ষ্মী ঠাকুরপো তুমিও এসোনা আমার সঙ্গে একটু সাহায্য করোনা। দেখবে এমন চমৎকার করে গুছিয়ে দেব যে বেশ বড় গোছের একটা লাইব্রেরীর মত দেখাবে।'

নান্তু উল্লসিত হয়ে উঠল, 'সত্যি লাইব্রেরী করবে বউদি?'

বড় একটা কাঁচের আলমারী আছে শ্বাশুড়ীর ঘরে। তাতে না আছে এমন জিনিস নেই। কম্বল, তোষক, ছেঁড়া নেকরার কয়েকটা বড় বড় পুঁটুলি, চিনে মাটির ফুলদানী, রাধাকৃষ্ণের পিতলের মূর্তি, সৌখীন অসৌখীন সব রকম জিনিসই ধরিয়েছেন তার মধ্যে।

নীলিমা বলল, 'মা ওই আলমারীটা আমার চাই।'

রমেনের মা সত্যবতী বললেন, 'ওমা সব জিনিসই তো তোমার।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু ও জিনিসগুলি আলমারীর ভিতর থেকে বের করে দিতে হবে। ওতে আমরা বই রাখব।'

সত্যবতী বললেন, 'আর জিনিসগুলি রাখবে বুঝি আমার মাথায়? করো তোমার যা ইচ্ছা।'

কিন্তু যা ইচ্ছা তাই করা সহজ নয়। তিন চার দিনের মধ্যে কিছুতেই অধিকার ছাড়লেন না সত্যবতী। এই নিয়ে মান অভিমান কথান্তর হতে লাগল। পাড়াপড়শীর কাছে বউয়ের অপবাদ পর্যন্ত রটালেন। দুদিন যেতে না যেতেই গৃহিনী সাজতে চায় বউ, সমস্ত ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে কেড়ে নিতে চায়। প্রতিবেশীরা মুচকে হাসল, এমন যে হবে এতো জানা কথা, পাশ করা বউয়ের এমনই হয়। তবু দমল না নীলিমা, জেদ ছাড়ল না নিজের। বলল, 'একবার দিয়েই

দেখুন। জিনিসগুলি যদি অন্য কোথাও আমি সাজিয়ে গুছিয়ে না রাখতে পারি তো দূষবেন আমাকে।'

শেষ পর্যন্ত হাল ছাড়লেন সত্যবতী। বাইরের একটা ঘরে কাঠের আলমারীটিকে সরিয়ে নিয়ে নীলিমা সযত্নে তার মধ্যে সাজিয়ে রাখল বই। নম্বর লাগাল প্রত্যেকটি বইতে। তালিকা তৈরী করল, যারা ধার নেবে বই তাদের জন্য তৈরী করল আর একটি খাতা। লাইন টেনে টেনে ঘর কাটল, তাদের নাম ধাম, বইয়ের নাম নম্বরের জন্য। সঙ্গী শুধু নান্তু আর উমা। একেকবার মনে হোল এ সব কি ছেলে মানুষি। কি মানে হয় এ সব ছেলে খেলার। দুদিন বাদে সে যখন চলে যাবে কোথায় থাকবে এ সব, কি মূল্য থাকবে এই পরিশ্রমের। কিন্তু এত দিনে তবু যেন একটা কাজ পেয়েছে নীলিমা, পেয়েছে নিজকে আচ্ছন্ন করে রাখবার একটা নেশা, খেলা। খেলাই বা মন্দ কি, তা যখন মনকে ভুলিয়ে রাখে, তা যখন মনকে আনন্দ দেয়।

কিন্তু আরম্ভটা এমন লঘু হলেও গুরুত্ব পেতে বেশিদিন লাগলনা। অল্প সময়ের মধ্যেই গাঁয়ে বেশ তোলপাড় তুলল বিষয়টা। গুরুজনেরা পরিহাস করে বললেন, 'দেখ গিয়ে রমেনের বি, এ, পাশ বউ লাইব্রেরী করেছে বাড়িতে।'

'কিছু একটা তো করা চাই-ই, না হলে কেবল রান্নাবাড়ায় তো আর পাশের মহিমা ফোটানো যায় না।'

'কিন্তু ছেলেদের মাথা খেতে 'নভেল নাটকই তো যথেষ্ট ছিল। এবার আগুনে ঘি পড়ল, চুড়ার উপর উঠল ময়ুর পুচ্ছ।'

তবু লঘুজনেরা ভিড় করে এল, এমন কি ও বাড়ির বিশু পর্যন্ত। বলল, 'বউদি, আপনাকে এর সেক্রেটারী হতে হবে।'

নীলিমা বলল, 'সেকি, আমার সার্টিফিকেট না দেখেই! আর তা তো জালও হতে পারে।'

বিশু বলল, 'আপনি বুঝি সে দিনের তামাসা ভুলতে পারেন নি।'

প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপ্রাণ খাটতে লাগল বিশু। অন্য বাড়ির

বউঝিদের বাক্স ট্রাঙ্ক খুলে তাদের সব উপহারের বই নিয়ে এল চেয়ে চিন্তে। বাড়াল বাড়ি বাড়ি ঘুরে পাঠকদের সংখ্যা। চাঁদা তুলে আনাল সংবাদ পত্র, মাসিক পত্র। সব আসতে লাগল লাইব্রেরীর সেক্রেটারীর নামে। আর প্রচারিত হোল, সেক্রেটারী স্বয়ং নালিমা মুখোপাধ্যায়।

নীলিমা লজ্জিত অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'ছি ছি, এ কি করলেন। সেক্রেটারী হবার মতো আরো অনেক যোগ্য লোক তো ছিলেন গাঁয়ে। আমি সেক্রেটারী হয়েছি শুনলে লোকে কি বলবে। ছি ছি কেমন শোনাবে সে কথা?'

বিশু বলল, 'কেন, চমৎকার শোনাবে, বেশ নতুন রকম শোনাবে দেখবেন। এ গাঁয়ে যোগ্য লোক হয় তো আরো কেউ কেউ ছিলেন, কিন্তু নামগুলি তাদের মোটেই যোগ্য আর শ্রুতিমধুর নয়। জগদ্বন্ধু মহলানবীশ, কি বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের চেয়ে নীলিমা মুখোপাধ্যায় নামটি প্রত্যেকের কানেই মধুর লাগবে। যার লাগবেনা তার কথা আমাদের কানে না নিলেও চলবে। কারণ তার নিজেরই কান বলে কোন পদার্থ নেই।'

নিজের নামটি বিশুর মুখে উচ্চারিত হতে শুনে নীলিমা আরক্ত মুখে বলল, 'বেশ তো খারাপ নাম বলে এতই যদি ক্ষোভ, বদলে রাখলেই পারেন নিজের নামটা।'

বিশু বলল, 'দরকার কি, নাম বদলালেই কি আর মানুষ বদলায়, না তার দাম বাড়ে।'

নীলিমা জবাব দিল না, তবু উৎসাহের অভাব রইল না বিশুর। উৎসাহ বেড়ে গেল নীলিমার, দেখা গেল লাইব্রেরী করলে হবে কি বই পড়ার মত বিদ্যাই অনেকের নেই। সুতরাং পাঠকের সংখ্যা যদি বাড়াতে হয় গোড়া থেকে তাদের পাঠাভ্যাসের ব্যবস্থা করা দরকার। পাড়ার নিরক্ষরা, স্বল্পাক্ষরা বউঝিদের জড়ো করে নীলিমা লেগে গেল তার লাইব্রেরীর ভবিষ্যৎ পাঠক সৃষ্টির কাজে। পরিকল্পনা চলল নাইট স্কুলের। যারা গঞ্জে বাজারে দোকান করে দিনের বেলায় রাত্রে

এই স্কুলে তারা এসে পড়বে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, শ্লেষ পরিহাসের অন্ত রইল না। শ্বাশুড়ী শাসন করলেন, সম্পর্কিত খুড়ো শ্বশুর, জেঠা শ্বশুরেরা এসে বুঝালেন নরমে গরমে, ও সব কাজ এসব জায়গায় হবার নয়।

নীলিমা বলল, 'চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি।'

শ্বশুরেরা বললেন, 'কিন্তু চেষ্টা করবার জন্য আরো অনেক লোক আছে। ঘরের বউ হয়ে দরকার কি তোমার ওদিকে মাথা ঘামাবার।'

নীলিমা বলল, 'আমারও দরকার আছে।'

'কেন বি, এ, পাশ করেছ বলে?'

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ, সেই জন্যই।'

অদ্ভুত আত্মপ্রত্যয় এসেছে নীলিমার মধ্যে। এতদিন পরে শক্তি বুঝতে পেরেছে নিজের। রুখে দাঁড়ালে কেউ তার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেনা। সমস্ত পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা তার কাছে হার মানবে। এই জঙ্গলকে সে সাফ করবে, সাফ করবে এখানকার জংলা মনকে। এই গাঁকে সে করে তুলবে শহর, শিক্ষায় দীক্ষায় গ্রামিক হয়ে উঠবে নাগরিক।

সমস্ত বাধা বিরোধকে অতিক্রম করে নৈশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দিন যখন ধার্য হয়ে গেছে ঠিক তার দুদিন আগে হঠাৎ রমেন এসে পৌঁছল। চিঠি নেই, পত্র নেই আসবার সম্ভাবনার কথা বিন্দুমাত্রও নীলিমাকে আগে জানায়নি, ভেবেছে হঠাৎ গিয়ে তাকে একেবারে চমকে দেবে। দেখবে অপ্রত্যাশিত আনন্দে কেমন দেখায় নীলিমার মুখ।

মুখ অবশ্য উজ্জ্বলই দেখাল। দুটো চোখ উচ্ছল হয়ে উঠল আনন্দে। নীলিমা বলল, 'ব্যাপার কি বলো তো।'

রমেন বলল, 'অনুমান করো।'

নীলিমা মাথা নেড়ে বলল, 'উঁহু যা একেবারে প্রত্যক্ষ তার সম্বন্ধে অনর্থক অনুমানের কষ্ট কে আর স্বীকার করতে যায় বলো।'

রমেন মনে মনে ভাবল, অনুমানে কি কেবল কষ্টই আছে, আনন্দ নেই। আসলে কথাটা নীলিমা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে তবু ধরা দিতে চায়না, দেখতে চায় রমেন কোন ভাষায় কি ভঙ্গীতে কথাটা পাড়ে।

নীলিমার মনোভাবের কথা ভেবে রমেন মনে মনে একটু হাসল ; না, কোনরকম কবিত্ব নয়, ভূমিকা নয়, উচ্ছ্বাস নয়, নিতান্ত সাধারণ আট পৌরে ঘরোয়া ভাবেই বলতে হবে কথাটা।

মনে মনে একটু গুছিয়ে নিয়ে রমেন বলল, 'বাক্স ডেক্স গুলি আজ রাত্রেই গুছিয়ে টুছিয়ে রাখ।'

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন ?'

বিস্ময়টা অত্যন্ত অকৃত্রিম মনে হোল রমেনের। সত্যি, অভিনয়ের পটুত্ব মেয়েদের সহজাত। কিন্তু নীলিমা যখন বাঁকা পথ নিয়েছে রমেন একেবারে সোজা রাস্তায় চলবে।

রমেন বলল, 'কেন আবার। এক সপ্তাহের তো মাত্র ছুটি। তাও রবিবার নিয়ে এর মধ্যে দুটো দিন তো বাসা ঝাড়তে পুছতে গুছাতে সাজাতে যাবে। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় দুদিন কিছুই নয়। তবু আপাতত এর মধ্যেই যা হয় ঠিক ঠাক করে নিতে হবে। উপায় কি।

নীলিমা বলল, 'সত্যই বাসা পেয়েছ তা হলে।'

রমেন বলল, 'কেন তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না ?'

নীলিমা বলল, 'আর সত্যিই কি কাল আমাদের রওনা হতে হবে ?'

রমেন নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'কেন তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না।'

নীলিমার মুখে কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল, 'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা নয়, কিন্তু কালই কি ক'রে যাই।'

এবার বিস্ময়ের পালা রমেনের। রমেন বলল, 'কেন, কাল তো দূরের কথা, আমার তো ধারণা এই মুহূর্তে বললে তুমি এই মুহূর্তেই তৈরী হয়ে নিতে পারো। অন্তত পারা উচিত। জানো কি কষ্টে বাসা পেয়েছি। কত সাধ্য সাধনায় মিলেছে ছুটি।'

নীলিমা স্বামীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নিচু ক'রে বলল, 'কিন্তু—'

রমেন অসহিষ্ণুভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু কি।'

নীলিমা তেমনি মৃদু কণ্ঠে বলল, কিন্তু পরশু যে আমাদের নাইট স্কুল খুলবে।'

কি একটা কঠিন কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ রমেন চুপ ক'রে গেল। আরো কি একটু অনুরোধ করতে গিয়ে স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল নীলিমা। কোন কথাই যেন আর বাকি নেই। কোন কথারই যেন প্রয়োজন নেই আর।

॥ সুদর্শন চৌধুরী ॥

আমার প্রাবন্ধিক বন্ধু সুদর্শন চৌধুরীকে নিয়ে গল্প লিখতে বসে মনে হচ্ছে, ওর সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা বরং এর চেয়ে সহজ ছিল। ওর সৌম্যদর্শন চেহারার বর্ণনা দিয়ে সুরু ক'রে চারিত্রিক ঋজুতা, আদর্শবাদ, নীতি নিষ্ঠা, বন্ধু আর সাহিত্য প্রীতির কথা উল্লেখের পর সে প্রবন্ধের উপসংহার করা চলত। সমাজ, সাহিত্য, ও দর্শন সম্বন্ধে ওর বিশিষ্ট প্রবন্ধগুলি ছাড়াও সমসাময়িক বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের যে সব সমালোচনা করেছে তার কিছু নিদর্শন তুলে দিলেই পরিষ্কার বোঝা যেত, মতামত আর পছন্দ অপছন্দ প্রকাশের ব্যাপারে সুদর্শন অত্যন্ত নির্ভীক, ওর রসবোধ আর রসবিচার একটু ক্লাসিক ধর্মী। আদি রসের বহুলতায় ওর বীতস্পৃহা অপেক্ষাকৃত ব্যাপক, সামগ্রিক জীবনের প্রকাশের শুধুমাত্র প্রয়াস দেখেই, যে ও হৃষ্ট-চিত্ত—সে সবও এই আলোচনায় ধরা পড়ত। সুদর্শন মানুষ হিসাবে যে সৎ, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের ছোট গণ্ডীর মধ্যে মহৎ—একটি প্রবন্ধের মধ্যে তাও নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে বলা চলত। কারণ কোন সৎ ব্যক্তি নিয়ে প্রবন্ধ লেখা অনেকটা সততা সম্বন্ধে নৈর্ব্যক্তিক প্রবন্ধ রচনার মতই। তার সত্যতা নিয়ে পাঠকের ঘন ঘন প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না, দায়িত্ব নিতে হয় না সংশয় নিরসনের। কিন্তু এখনকার দিনে কোন সৎ ব্যক্তিকে গল্পে ব্যক্ত করতে পারা বড় শক্ত। তার বাস্তবতা সম্বন্ধে পাঠকের মনের প্রশ্ন বোধক চিহ্নগুলি খড়্গের মত লেখকের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

প্রবন্ধে আরও অনেক সুবিধা ছিল। মাত্র ক'টি পৃষ্ঠার মধ্যে সুদর্শনের বাল্য, কৈশোর আর প্রথম যৌবনের ইতিবৃত্ত দিয়ে তার সদসৎ বহু গুণের উল্লেখ করা যেত। কিন্তু একটি গল্পে ওর সম্বন্ধে দু' একটি

কথার চেয়ে বেশি বলতে আমি তো সাহস পাইনা, বেশি গুণের কথা বলতে গেলেই গল্পের পক্ষে সেটা গুণ হয়ে, দোষ হবে বিস্তার বেলায়।

এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই প্রাবন্ধিকের পরিচয় দিতে গিয়ে কেন যে সত্যি সত্যিই প্রবন্ধ লিখতে চেষ্টা করলাম না তার কারণটা এবার বলি। কারণ শুধু এই নয় যে সুদর্শনের মত চিন্তা আর জ্ঞানানুশীলন আমার নেই, প্রবন্ধ লিখতে গেলে বার বার আমার কলম বন্ধ করতে হবে, কিন্তু তার কারণ কেবল এও নয় যে, সে প্রবন্ধ পড়ে তাতে হাস্যরস না থাকলেও দু' এক মিনিট বাদেই সুদর্শন হাসতে হাসতে তা বন্ধ করবে। আসল কারণটা হোল এই যে সুদর্শন গোড়ায় গল্প কবিতা লিখতে লিখতে কি ক'রে এমন গোড়া প্রাবন্ধিক হয়ে পড়ল সেটা গল্পেরই বস্তু, প্রবন্ধের বিষয় নয়। সুদর্শনের প্রথম গল্প কলকাতার অধুনালুপ্ত একটি মাসিক কাগজে ছাপা হয়ে যখন বের হয়, ও তখন কুমিল্লা কলেজে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। পরীক্ষার্থী। দু' তিন দিন বাদেই কেমিষ্ট্রীর পরীক্ষা। রসায়নের রস বসে বসে গলাধঃকরণের চেষ্টা করছে সুদর্শন, হঠাৎ ডাক পিওন এসে ছোট একটা সবুজ রঙের মোড়ক লাগানো মাসিক পত্রিকা দিয়ে গেল ওর হাতে। কেমিষ্ট্রির মোটা বই ঠেলে রেখে ও তাড়াতাড়ি সেই রঙীন মোড়ক ছিঁড়ে ফেলল। উল্টাতে লাগল মাসিক পত্রিকার পাতা, তারপর এক জায়গায় এসে আর উল্টালোনা। চুপ ক'রে চেয়ে রইল। ততক্ষণ মোড়কের সবুজ রঙ কেবল কাগজে নয়, ওর চোখ থেকে সমস্ত দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সুদর্শনের গল্পটি ছাপা হয়েছে কাগজে। সেই সঙ্গে ওর নিজের নাম। ছাপার অক্ষরে নিজের নাম প্রথম দর্শনে কি অদ্ভুতই না লাগে। এও এক ধরণের আত্মদর্শন।

ষোল-সতের বছর আগেকার সুদর্শনের সেই কাগজ আমি কোন দিন দেখিনি, ওর সেই প্রথম গল্পও পড়া হয়নি আমার। অনেক বছর বাদে 'অগ্রদূত' অফিসে যখন ওর সঙ্গে আমার আলাপ, সে গল্পের, সে কাগজের কোন চিহ্নই ওর কাছে তখন ছিল না। তখন কেন, তার

অনেক আগেই ও সে সব হারিয়েছে। ইচ্ছা ক'রেই হারিয়েছে।' কিন্তু ইচ্ছা করে হারাতে চাইলেই কি সব থেকে সব হারায়?

সে গল্পের সারাংশ আমি সুদর্শনের কাছে শুনেছিলাম। যৌবনের প্রারম্ভে লেখা কাঁচা হাতের মামুলী কাঁচা গল্প। তবু সে গল্পটুকু অতি সংক্ষেপে আমাকে বলে নিতেই হবে। কারণ এক হিসাবে ওর সে গল্প আমার এগল্পের ভূমিকা।

ছোট্ট সুন্দর মফঃস্বল সহর। সেখানে থাকেন নামকরা ডাক্তার ভুবন মহলানবাশ। তিনি কেবল ডাক্তারীতেই নাম করেননি, বিদ্বান, রসজ্ঞ পণ্ডিত বলেও তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর মেয়ে মীনাক্ষী। দেখতে শুনতে অলোকসামান্যা। সতের আঠার বছরের কুমারী মেয়ে। ভারি স্নিগ্ধ মিষ্টি চেহারা, সুমিষ্ট ভাষা।

ভুবনবাবুর কাছে চিকিৎসার জন্য অনেক রোগী আসে যায়। পাশের গাঁ থেকে সুভদ্র সেনও এল। উনিশ থেকে কুড়িতে পা দিয়েছে সুভদ্র। রূপবান, রুচিবান, উন্নত দর্শন যুবক। কিন্তু একটু রোগে ভুগছে। রোগটা টনসিলের। ভুবনবাবুর চিকিৎসায় অল্প দিনেই তার সে রোগ আরোগ্য হোল। কিন্তু ডাক্তারের বাসায় সুভদ্রের যাতায়াত খান্ত হোলনা। কারণ সুভদ্রের বিদ্যানুরাগ ভুবনবাবুর ভালো লেগেছিল।

ভুবনবাবুকেও সুভদ্রের ভালো লাগল, আরো বেশী ভালো লাগল মীনাক্ষীকে। যখন সুভদ্র আর ভুবনবাবুর আলাপ আলোচনা চলে, মীনাক্ষী এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে। কেবল কি শোনে, দেখেও। সুভদ্র যদি তা দেখে ফেলে, মীনাক্ষী তাড়াতাড়ি চা আর খাবার আনবার ছলে চলে যায়। কিন্তু চায়ের কাপ আর খাবারের ডিস্ নিয়ে ফের ও চলেও আসে। সুভদ্র বুঝতে পারে মীনাক্ষী আসবে বলেই গিয়েছিল। ওর যাওয়াটাও ছল নয়, আসাটাও ছল নয় ছল শুধু ওই চা আর জলখাবার টুকু।

তারপর একদিন যখন ভুবন মহলানবীশ অনেক দূরে গেছেন রোগী দেখতে, আর বৃষ্টির জন্য তাঁর বাড়িতে এসে আটকা পড়ে গেছে

সুভদ্র তখন যে জানলার কাছে সে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, মীনাক্ষীও তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বাবার আসতে বোধহয় আরো দেরি হবে। তোমার চা নিয়ে আসি!'

সুভদ্র মাথা নাড়ল, 'না চায়ের আজ দরকার নেই।'

মীনাক্ষী মৃদু হাসল, 'সেকি, এই বৃষ্টির দিনে চা-ই তো সব চেয়ে, ভালো লাগবে।'

সুভদ্র বলল, 'সব বৃষ্টির দিনেই কি চা ভালো লাগে?' মীনাক্ষী কোন কথা বলল না।

সুভদ্র আস্তে আস্তে ওর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিল।

একটু চমকে ওঠল মীনাক্ষী। একটু চুপ ক'রে রইল, তারপর আস্তে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ছেড়ে দাও, আমি বিধবা।'

'বিধবা!'

মীনাক্ষী বলল হ্যাঁ, 'বাবার জন্যই আমি সাদা থান পরতে পারিনে। দুটি চুড়িও পরে থাকতে হয় হাতে।'

সুভদ্র বলল, 'কেবল দুটি চুড়ি কেন, নতুন করে আরো বেশী অলঙ্কার কি তুমি ফের পরতে পারনা?'

মীনাক্ষী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, না তাও হয় না। এসব দিক থেকে বাবা গোঁড়া ধর্ম্মভীরু ব্রাহ্মণ আর তুমি নাস্তিক বৈদ্য।'

সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেল সুভদ্র, আর এলনা।

কিন্তু সরোজিনী এলেন সুদর্শনদের বাসায় বেড়াতে। তিনি কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ভবানী ভট্টাচার্যের স্ত্রী। পাশের বাড়িতেই থাকেন সুদর্শন কোথায় বেরিয়েছে। সুদর্শনের ছোট বোন লীলা বলল, 'দাদার একটা গল্প ছাপা হয়েছে, দেখেছেন মাসীমা?'

'তাই নাকি দেখি, দেখি।'

সরোজিনী কেবল দেখলেন না, গম্ভীরভাবে তাঁর স্বামীকেও দেখালেন, বললেন, 'এত করে বারণ করেছি, মিনতিকে তোমার ওই গুণধর ছাত্রের সামনে কিছুতেই বেরুতে দিয়োনা। এবার হোলো

তো ? এখন এসব কথা যদি মিনতির শ্বশুর বাড়ীতে যায়, এই বই যদি কোন রকমে রোগা জামাইয়ের হাতে পড়ে তা'হলে তার মনের অবস্থাটা তখন কি হবে শুনি ? ছি ছি ছি, তোমার ওই ছাত্র যেন আমার বাড়ীতে আর না ঢোকে।'

ভবানী বাবু বললেন, 'কিন্তু এতো গল্প।'

সরোজিনী বললেন, 'গল্প ! তোমার মত সবাই তো আর চশমা এঁটে দিনরাত বসে থাকে না। এ গল্প যে পড়বে তার কি আর কিছু বুঝতে বাকী থাকবে না কি ? দেখনা নামগুলি পর্যন্ত কেমন মিলিয়ে মিলিয়ে রেখেছে। ছি ছি ছি—গল্পের সুভদ্র যে ওই সুদর্শন ছোঁড়া তা কি আর কারো বুঝতে বাকি থাকে ? বাকি থাক তাই কি ও চায়, সাবধান মিনতির হাতে যেন এ গল্প না পড়ে।'

মিনতি সে গল্প পড়েনি। তবু শুনেছিল। সুদর্শনের কাছ থেকে নয়, বাপ-মার মধ্যে যে আলোচনা চলেছিল আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই আলাপে সে উৎকর্ণ হয়েছিল।

তারপর দু' তিন দিন বাদেই মিনতিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় তার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হোল। প্লুরেসী থেকে তার স্বামী তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছে।

কথাটা সুদর্শনের বাপ মার কানেও উঠল। মানে সরোজিনীই দিলেন ওদের কানে।

সুদর্শনের বাবা রীতিমত শাসন করলেন ছেলেকে, 'ছি ছি ছি জাতমান আর রইলো না ; ফের যদি তোকে গল্প কবিতায় হাত দিতে দেখি তো তার মজা আমি দেখিয়ে ছাড়ব।'

কিন্তু মিনতির বাবা, কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক ভবানী ভটচার্য প্রায় ওই কথাগুলিই এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করলেন যে সুদর্শন তা কোনদিন ভুলতে পারল না, আর বোধহয় সেইজন্যই প্রাবন্ধিক হলো।

কলেজের মধ্যে শুধু সুদর্শনই সেবার কেমিষ্ট্রীতে লেটার পেল। আর সেই খবর পেয়ে ভবানী মোহন নিজে এলেন ওদের

বাসায়। সুদর্শনকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমি আমার মান রেখেছ।'

সুদর্শন মুখ নিচু করে বলল, 'কিন্তু স্যার সবাই যে অন্য কথা বলে।'

ভবানী বাবু একটু হাসলেন, 'কি বলে! সুভদ্রের মধ্যে সুদর্শন রয়েছে এই তো? তারা বোকা, একেবারে বোকা, তারা গল্পের কিছু বোঝে না। সুদর্শন কি কেবল এই সুভদ্রের মধ্যেই আছে? সে ডুব দিয়েছে ওই ভুবন মহলানবীশের মধ্যে, ডুব দিয়ে দেখেছে ওই মীনাক্ষীর মধ্যে। সুদর্শন নিজে যদি সুভদ্র হয়, সে তাহলে মীনাক্ষীও। তাকে একেকবার একেক রকম হতে হয়েছে। কেবল তো দেখে দেখে লেখা যায় না, হয়ে হয়ে লিখতে হয়।

বিজ্ঞানের এই প্রৌঢ় অধ্যাপকের মুখের দিকে সুদর্শন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেই মুহূর্তে তার মনে হোল এই অধ্যাপকের কালো বেমানান লম্বাটে মুখ মিনতির মুখের চেয়ে আরো অনেক বেশী সুন্দর। ঘনীভূত জ্ঞান আর ঘনীভূত রসে কোন পার্থক্য নেই। প্রভেদ নেই রসায়নে আর রসশাস্ত্রে।

একটু বাদে সুদর্শন তার অধ্যাপককে বলল, 'কিন্তু স্যার এসব কথা আপনি জানলেন কি করে! আপনি তো কোনদিন গল্প লেখেননি। এসব জিনিষ এমন করে আমিও তো ভাবিনি, অথচ মনে হচ্ছে এ যেন আমারই ভাবা কথা, আমারই মনের কথা।'

অধ্যাপক সবিনয়ে বলিলেন, 'এ শুধু তোমার কথাও নয়, আমার কথাও নয় সুদর্শন। আমাদের আগে আরও অনেক জ্ঞানী গুণী এক এক জন এক এক রকম করে এ সব কথা বলে গেছেন। তবু যখন কোন কথা নিজের উপলব্ধি দিয়ে বলি, নিজের অন্তর দিয়ে শুনি, তখন মনে হয় নতুন বললাম, নতুন শুনলাম। যত পড়বে ততই বুঝতে পারবে, ততই জানতে পারবে, উপলব্ধির ক্ষমতাও ততই বাড়বে। জ্ঞানের চেয়ে বড় আনন্দ দুনিয়ায় আর কিছু নেই।'

সুদর্শন বলল, 'কিন্তু রসের আনন্দ কি আরও বড় নয়?' অধ্যাপক

বললেন, 'অন্তত এখন নয়, যতক্ষণ আরও বড় না হচ্ছ ততক্ষণ নয়। এ বয়সে রসের পথ পিচ্ছিল। এখন শুধু একাগ্র মনে জ্ঞানের চর্চ্চা কর, জ্ঞানার্জ্জনে মন দাও। সংস্কৃতের একটি শ্লোকে আছে 'কাব্যং হন্যতে শাস্ত্রং।' এ বয়সে 'কাব্য চর্চ্চায়, শাস্ত্র চর্চ্চা নষ্ট হবে, সঙ্গীত চর্চ্চায় কাব্য চর্চ্চা নষ্ট হবে, আর রমণীর রূপে যদি আসক্ত হও তা'হলে তোমার সঙ্গীত, কাব্য, শাস্ত্র কিছুই আর অবশিষ্ট থাকবে না।'

কথাগুলি সুদর্শনের তখন তেমন ভালো লাগেনি। বড় রূঢ়, বড় নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। কিন্তু অধ্যাপকের সেই জ্ঞানার্জ্জনের উপদেশ সে ভুলতে পারে নি। অধ্যাপক আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'শুধু জ্ঞান। এখন শুধু জ্ঞান। রসের অভাব কি, রস তো সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে রয়েছে। রস আছে তোমার বাবার মায়ের স্নেহে, ছোট ভাই বোনদের শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যে, রস রয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধু-সঙ্গমে। কিন্তু জ্ঞান অত সহজলভ্য নয়, সুদর্শন। অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক তপস্যায় তাকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তবে ঘরে নিতে হয়। তুমি জ্ঞানের পথ থেকে কোনদিন ভ্রষ্ট হয়োনা, জ্ঞান তোমাকে সব চ্যুতি বিচ্যুতি থেকে রক্ষা করবে।'

অধ্যাপককে ভালো লাগল, তবু কেন যেন কুমিল্লাকে আর ভালো লাগল না সুদর্শনের। কলকাতায় একটি সস্তা মেস খুঁজে নিল। কিন্তু সস্তা কলেজের দিকে ঝুকলনা। ভর্ত্তি হোল প্রেসিডেন্সীতে, অনার্স নিল গণিত শাস্ত্রে আর রইল ফিলজফী।

অধ্যাপক কুমিল্লা থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে লিখলেন, 'সায়ান্স ছেড়ে দিলে!'

সুদর্শন জবাব দিল, 'ঠিক ছাড়লাম না, আবার পড়ব। এখন দর্শনটা একটু পড়ে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

অধ্যাপক আশীর্বাদ জানিয়ে লিখলেন, 'বেশ তো।'

কিন্তু সুদর্শনের সঙ্গে যখন আমার আলাপ ও তখন 'অগ্রদূত' দৈনিক কাগজে চাকরি করে। সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখে। কিন্তু মন্তব্যে ওর মন নেই। এর আগে আরও অনেক জায়গা ঘুরে এসেছে। সে সব অফিসে ওর মন বসেনি।

আমার দশাও ঐ শনির দশা। ঘুরে ঘুরে এসেছি 'অগ্রদূতে'। আমি অবশ্য সুদর্শনের ঘরে বসিনা। আমার চাকরি ওর নিচের তলায় বসে বসে ইংরাজী সংবাদের বঙ্গানুবাদ করি। কিন্তু আমারও মন বসেনা।

একদিন 'অগ্রদূতের'ই রবিবাসরীয় এক সংখ্যায় 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসের' ওপর প্রবন্ধ বেরুল, শুনলাম প্রবন্ধকার ওপরেরই সুদর্শন চৌধুরী। সে প্রবন্ধে লেখক সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের গতি প্রকৃতির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। চেষ্টা করেছেন ভবিষ্যৎ দিক নির্ণয়ের। ভাল লাগল। নিজের চিন্তার জোরে তিনি অন্যের মনে চিন্তার উদ্রেক করতে পারবেন।

ওপরে এসে আলাপ করলাম। সব জায়গায় মতের মিল হোল না। তিনি ব্যাপ্তির দিকে জোর দিয়েছেন। আমি গভীরতায় বিশ্বাসী। ওঁর ঝোঁক একান্তভাবে আদর্শবাদের দিকে। আমি বলি সেই সঙ্গে বাস্তবতা যেন বাদ না যায়, তাহলে সব বাদ যাবে। তিনি বলেছেন ভাষা নয় ভঙ্গি নয়, ভাবটাই আসল। কথা নয়, কথ্যই পরম সত্য। আমি বলি ও দুটোকে আলাদা করা যায় না, ওরা অভিন্ন। রসে এসে ভিতর আর বাহির আলাদা থাকে না। সব মিশে একাকার হয়। এক হয় না বলেই তো আপত্তি।

তিনি বললেন, 'কিন্তু এমন লোক কি দেখা যায় না যে দেখতে খারাপ অথচ ভিতরটা ভালো। সেই সততাই কি সব চেয়ে বড় নয়?'

আমি বললাম, 'ওটা উপমার কথা হোল। প্রাকৃতিক সৃষ্টির সঙ্গে শিল্পসৃষ্টির তুলনা চলে না। সেটা অপ্রাকৃতিক। উপমাই যদি দেন তবে বলি যিনি দেখতেও ভালো তিনিই রসের পূর্ণাবতার। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ কিম্বা গৌর অঙ্গের রবীন্দ্রনাথ! তাঁদের রূপও যা স্বরূপও তাই, ভাষাও যা ভাষ্যও তাই। এঁরা কুরূপ হ'তে সাহস পান নি।'

তিনি শেষে বললেন, হেসেই বললেন, 'কিন্তু পূর্ণকে তো সব সময় পাওয়া যায় না। ওপরটা ভালো ভিতরটা ফাঁকা, আর ওপরটা খারাপ ভিতরটা ভরাট—আপনি কোন্ অংশকে নেবেন, কল্যাণ বাবু?'

হার মেনে বললাম—'শেষাংশটাই কল্যাণের।'

দু'জনের মিল হোল। ক্রমে আপনি থেকে আরো আপন হোল সম্বোধন। ভূমিতে নামলাম। কেবল আমিই ওপরে উঠি না, সুদর্শনও মাঝে মাঝে নীচে নামে। দেখলাম ঘর একতলায় আর দোতলায় আলাদা হলে হবে কি, ঘরানা দুজনের একই।

অনুপ্রাসের খাতিরে সঙ্গীত জগতের এই পরিভাষাটা আমি নিতান্তই ব্যবহার করলাম। আসলে আমার নিজের কোন সুরজ্ঞান নেই, কিন্তু ওর আছে।

সুদর্শন বলল, 'আছে আর বলোনা, বল ছিল।'

একদিন বললাম, 'চল দেখে আসি—মানে শুনে আসি তোমার কি ছিল আর কি নেই। গান তোমাকে শোনাতেই হবে।'

সুদর্শন হেসে বলল, 'চল।'

ইণ্টালী অঞ্চলে পুরোণ একতলা বাড়ি। জলের বিশেষ সম্ভাব নেই, বিদ্যুতের একান্ত অভাব আছে। ঘরের সংখ্যা চার পাঁচখানা। কিন্তু বাসিন্দার সংখ্যা চৌদ্দ পনের জন। বাপ-মা, ভাই-বোন, পিসী-মাসীর একান্নবর্তী পরিবার। এই পরিবেশের মধ্যে সুদর্শনকে নতুন রকমের মনে হোল।

সুদর্শন তার ছোট'দু ভায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, সুব্রত আর শুভব্রত। একজন সেতারী আর একজন ছবি আঁকে।

ওরা চলে গেলে সুদর্শন ভাইদের উদ্দেশ্যে পরম স্নেহে বলল, 'তেমন যত্ন নিতে পারিনে। অর্থও নেই সামর্থ্যও নেই। তেমন সুযোগ সুবিধা পেলে ওরা আরো বড় হোত। যাক দু'জনেই fine artist হয়েছে এই যা সান্ত্বনা।'

একটু যেন করুণ সুরের আভাস পেলাম ওর গলায় বললাম, 'দুজন কেন তিন জন বল। তুমিও তো—'

সুদর্শন মাথা নাড়ল, 'না কল্যাণ আমি এখন আর fine artist নই। আমি স্রষ্টা নই আর। একেক সময় মনে হয় ভবানীবাবু আমার সর্বনাশ করেছেন। আমার মনে জ্ঞানের আর রসের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি

করে রেখেছেন। আমাকে এক পথ নিতে দেন নি। এক মত হতে দেন নি। কিংবা তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমার নিজেরই দ্বিধা বিভক্ত প্রকৃতি আমাকে দু'দিকে টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু কোন দিকে টেনে রাখে না।'

অনেক অনুরোধ সত্বেও সুদর্শন সেদিন কিছুতেই গান শোনাল না, বলল, 'এখন আর হবে না। ছেড়ে দিয়েছি। এখন আর গাই না। গানের গ্রামার নিয়ে গানের কাগজে আলোচনা করি।'

বললাম, যত্ন করে যদি শিখেই ছিলে ছাড়লে কেন?'

সাদা চাদর পাতা অল্প দামী তক্তপোষের ওপর বসে হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় সুদর্শন সেদিন অনেক কথা বলল। চার পাঁচ বছর ধ'রে কত দুঃসাধ্য চেষ্টায় সাংসারিক কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে কত লড়াই ক'রে গভীর এক নিষ্ঠায় ও সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিল। কিন্তু হঠাৎ এক বন্ধুর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের আলোচনা উঠতেই নিজের অজ্ঞতায় ওর মাথা নিচু হয়ে গেল। বহুদিন ধরে পৃথিবীর ও কোন কিছুর খবর রাখেনি। শুধু বিজ্ঞান নয়; দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি সব বাদ পড়ে গেছে। কিন্তু সব বাদ দিয়ে জীবন নয়, সব নিয়ে জীবন। এতদিন সুরের জালে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল, আর কিছুই ওর মনে ছিল না। সেই জাল ও নির্মমভাবে ছিঁড়ে বেরিয়ে এল। নতুন করে স্বাদ পেল অধ্যয়নে। যে সঙ্গীত এতদিন তার শাস্ত্রকে হনন করেছে, শাস্ত্র দিয়ে সেই সঙ্গীতকে পীড়ন ক'রে সুদর্শন তার শোধ নিল।

আমি কিছুক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কিন্তু দুই-ই তো এক সঙ্গে চলতে পারে। একেবারে সঙ্গে সঙ্গে না হোক, একটু আগে পরে। একজন প্রথমা, একজন দ্বিতীয়া।'

সুদর্শন বলল, 'আমি তা পারি না। আমার প্রথমা দ্বিতীয়া নেই। আমার প্রিয়তমা একতমা।'

চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি সুন্দরী তন্বী বধূ চায়ের কাপ হাতে এঘরে আসছিলেন। সুদর্শনের কথাটা কানে যেতেই আরক্ত হয়ে চৌকাঠের কাছে থেমে দাঁড়ালেন।

সুদর্শন তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল, 'এসো এসো। তোমাকে আর লজ্জা পেতে হবে না। কথাটা তোমাকে বলিনি স্বস্তি।'

শান্ত মৃদু কণ্ঠ শুনতে পেলাম, 'তা জানি।'

একটু চমকে উঠলাম। জানি মানে? মিনতির গল্প সুদর্শন তার স্ত্রীকেও বলেছে নাকি?

সুদর্শন কিন্তু স্মিতমুখে স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'জানো যদি তো লজ্জা পাচ্ছিলে কেন? লজ্জাতেই যে ধরা পড়ে যাচ্ছ।'

স্বস্তি একথার কোন জবাব না দিয়ে আমাদের সামনে চা আর খাবার এগিয়ে দিল। সুদর্শনের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ এখনো স্বল্প। আমি তাঁকে কোন রকম সম্বোধন না করলেও ক্রিয়াপদ আর সর্বনামে সম্ভ্রম রক্ষা করি। কিন্তু এখানে চরিতকারের স্বাধীনতা নিয়ে শুধু নামই ব্যবহার করলাম, ক্রিয়াপদকেও হালকা করলাম একটু। শিষ্টাচার এতে ক্ষুণ্ণ হলেও ওরা নিজেরা মোটেই মনঃক্ষুণ্ণ হবে না আমি তা জানি।

আমি সুদর্শনের কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বললাম, 'নামটা নিজের দেওয়া নাকি?'

সুদর্শন অমনিতে বন্ধু বৎসল; এক্ষেত্রে, কিন্তু আমার গোপন বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু রাখল না! আমার মৃদুস্বরকে উচ্চৈস্বরে ধ্বনিত করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'কল্যাণ, আমার কানে কানে কি বলল জানো?'

স্বস্তি একটু বুঝি আন্দাজ করেছিল, কিন্তু সেটুকু স্বীকার না করে ঘার নেড়ে মৃদু হেসে বলল, 'না'। সুদর্শন বলল, 'ও জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার নামটা আমার দেওয়া কিনা।' তারপর আমার দিকে ফিরে তাকাল সুদর্শন, 'কেন ওরা গরীব বলে বাপের বাড়ী থেকে নিজের নামটাও কি নিয়ে আসতে পারে না? না কল্যাণ, অত কবিত্ব আমার নেই, ও নাম আমার দেওয়া নয়। আমি বড় জোর ওর নামের সঙ্গে মাঝে মাঝে একটা 'অ'যোগ করি।'

হেসে বললাম, 'অস্বস্তি;—ওটা তো নিতান্তই মুখের,' সুদর্শন অসঙ্কোচে বলল, 'সব সময়েই যে মুখের তা কি করে বলি?'

আমি ওর স্ত্রীর দিকে তাকালাম। স্বস্তি ভারি স্বল্পভাষিনী, কোন কথা না বলে আমাদের সামনে থেকে চায়ের কাপগুলি সে সরিয়ে নিতে লাগল।

সুদর্শন আমার দিকে চেয়ে বলল, 'ওকে নাম দেব কি, নিজের নাম মান, খেয়াল-খুসি নিয়েই অস্থির। সেই চাপে সব ঢাকা পড়ে যায়। নামধাম দূরের কথা আর একটু যে লেখাপড়া শেখাব, তা পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। মোটা ভাত, মোটা কাপড় ছাড়া আমরা স্ত্রীকে আর কি-ই বা দিতে পারি?'

'থাক হয়েছে।'

স্বস্তি একটু হাসল।

ওর পরণে চওড়া লালপেড়ে সাধারণ মিলের শাড়ি। হাতে শাঁখার সঙ্গে দু'গাছা ক'রে চুড়ি। কানে লাল পাথর বসানো পাতলা সোনার ফুল; ফর্সা কপালে নাতিবৃহৎ সিঁদুরের ফোঁটাটি বেশ মানিয়েছে। কিন্তু সব মিলে কেমন যেন একটা করুণ ভাব। চেহারাটা রোগা রোগা বলেই বোধ হয় এমন দেখাচ্ছে।

কাপ প্লেটগুলি গুছিয়ে নিয়ে স্বস্তি আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে একটু হাসল, 'যাই এবার রান্নাঘরে মেয়ে দুটো মাতলামি সুরু করেছে।'

একটু চেঁচামেচির শব্দ শোনা যাচ্ছিল ঠিকই, আমি ঘাড় নাড়লাম।

স্বস্তি বলল, 'আর একদিন আসবেন কিন্তু।'

ও ঘরের বাইরে চলে গেলে সুদর্শন ফের বলল, 'সত্যি প্রায়ই আমি ভাবি। এত দেওয়ার ছিল, অথচ কি-ই বা দিতে পারলাম।'

স্বস্তি আর একবার ফিরে তাকিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। ওর মুখে তেমন কোন ক্ষোভের চিহ্ন দেখলাম না। মনে হোল নিজের না দিতে পারার দুঃখের মধ্যে সুদর্শন স্ত্রীকে অনেকখানি দিয়ে রেখেছে।

এর পরে আরো দু'চার দিন এসেছি। কিন্তু তারও পরে আর একদিন যখন এলাম তখন পারিবারিক আবহাওয়া আর তেমন শান্ত-স্নিগ্ধ নেই; অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। জ্ঞান আর রসের দ্বন্দ্ব নয়—ভিন্ন ধরণের সংগ্রামের ছাপ লেগেছে।

ওদের মুখ দেখে বুঝলাম, খানিকক্ষণ আগে ঝড় বয়ে গেছে দাম্পত্য কলহের। সে কলহে মাধুর্য নেই।

স্বস্তি আমাকে দেখে সাক্ষী মেনে বলল, 'আচ্ছা, আপনিই বলুন তো কল্যাণবাবু, ওই অফিসে থেকে উনি আর কি করবেন? চার-পাঁচ মাস ধরে মাইনে নিয়ে ওরা গোলমাল করছে, অফিস উঠে যাবে তবু তিনি অন্য জায়গায় যাবেন না। এই তো আপনারাও তো সময় থাকতে চলে গেছেন।'

স্বস্তির কথায় কোন খোঁচা ছিল না। তবু মনের মধ্যে একটু খোঁচা লাগল। কথাটা ঠিক, আরো কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আমি সময় থাকতেই সরে গেছি বটে। চলে গেছি অন্য একটা নতুন কাগজে। না গিয়ে কি করব? বহু দিন ধরেই মাইনের গোলমাল চলছিল। 'অগ্রদূত' যে চলবে তেমন আর ভরসা ছিল না। অন্য জায়গায় সুযোগ পেয়ে আমরা সরে এলাম। সুদর্শন সে সুযোগটি পেতে পেতে পেল না।

কিন্তু আর একটা সাপ্তাহিক কাগজে সুদর্শন এ সময় চান্‌স্‌ পেয়েও ছেড়ে দিল।

আমরা বন্ধুর দল অবাক হয়ে বললাম, 'এ কি করলে? 'সপ্তর্ষি' তো শুনেছি বেশ বড়লোকের কাগজ, ওখানে গেলেই পারতে!'

সুদর্শন বলল, 'পারতাম না, ওদের মতের সঙ্গে বনিবনাও হোত না। নীতির সঙ্গে মিলত না আমার।'

বললাম, অগ্রদূতের নীতির সঙ্গেই কি তোমার মিলছে?' সুদর্শন বলল, 'না, তাও মিলছে না। তবু দেখি টাকাগুলি আদায় হয় কি না। অনেকগুলি টাকা বাকি পড়ে আছে। গেলে তো আর এক পয়সাও পাব না। মামলা মোকদ্দমা করে শ্রীপতি দত্তের কাছ থেকে কেউ টাকা আদায় করতে পারে নি তাতো জানো।'

শ্রীপতি দত্ত অগ্রদূতের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর।

এই যুক্তিতে স্বস্তি একটু নরম হোল। কিন্তু হাতের সপ্তর্ষির চাকরিটা ছেড়ে দেওয়ায় স্বস্তি স্বামীকে ভিতরে ভিতরে ক্ষমা করতে

পারল না। ও চাকরি নিয়ে ও তো টাকার তাগিদ করা যেত। এদিকে সংসারের অবস্থা খারাপ। অসুখ-বিসুখ লেগেই আছে বাড়ীতে। স্বস্তির নিজেরও স্বাস্থ্য ভালো নয়। একান্নবর্তী পরিবারে বড় ভাইয়ের অনেক দায়িত্ব। সে দায়িত্বে ত্রুটি হচ্ছে সুদর্শনের। একান্নবর্তী পরিবারে বড় বউয়ের অনেক মর্যাদা, সে মর্যাদায় হানি ঘটছে স্বস্তির।

কিন্তু আজকের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের।

স্বস্তি বলল, 'জানেন, শ্রীপতি দত্ত ওকে সব টাকা দিয়ে দিতে চাইছিলেন। বলেছিলেন, টাকা নিয়ে আপনি চলে যান। তবু উনি সে টাকা নিলেন না। এমন মানুষ!'

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বল কি হে। টাকা পেয়েও তুমি নিলে না কেন?'

সুদর্শন আমার দিকে চেয়ে বলল, 'যে সর্তে টাকা পেতে যাচ্ছিলাম সে সর্তে টাকা আমি নিতে পারি না কল্যাণ।'

'সর্তটা কি?'

স্বস্তির কাছেই শুনে নিতে হোল ঘটনাটি।

অগ্রদূত অফিসে মাইনে নিয়ে মাসের পর মাস গোলমাল চলতে থাকায় কর্মচারীদের একটা সঙ্ঘ গড়ে উঠল। কম্পোজিটার আর সবাই মিলিল সেই দলে। সুদর্শনের কাছে এল দলপতি হওয়ার আহ্বান। সঙ্ঘটা এর আগেও ছিল। সুদর্শন তাতে নামে মাত্র থাকলেও এ সব ব্যাপারের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু অফিসে যখন ভাঙন ধরল, আগেকার দলপতিরা যখন দল বেঁধে নানা জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেল, তখন জনকয়েক কম্পোজিটার এসে ধরে বসল সুদর্শন বাবুকে।

'আপনি একটা বিহিত করুন, শ্রীপতি দত্তকে বলেটলে টাকাগুলি আদায় করে দিন। অন্তত আধা-আধি টাকা পেলেই আমরা চলে যাই।'

সুদর্শন অসহায়ভাবে বলল, 'কিন্তু আমি কি করব? আমি তো এসবের মধ্যে—'

এ সবের মধ্যে নিরীহ ভালো মানুষ সুদর্শনবাবুকে কম্পোজিটারেরাও এর আগে টানতে চায়নি। কিন্তু এখন আর না টানলে চলে না। ভাঙ্গা হাটে লোক আর বড় বেশী নেই। যারা আছে, তারাও এই নিষ্ফল সর্দারী নিতে চাইছে না। সবাই চাকরি খুঁজছে, সুযোগ পেলেই চলে যাবে।

সুদর্শন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা।'

তার নিজেরও অনেক টাকা পড়ে রয়েছে। এভাবে কিছুটা যদি আদায় হয় মন্দ কি।

কোন কোন বিষয়ে শ্রীপতি দত্তকে শ্রদ্ধা করে সুদর্শন। বেশ শক্ত জবরদস্ত লোক, ক্ষমতা আছে অফিস চালাবার। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। কিন্তু কেবল নিজের জেদের জোরে একটা দৈনিক কাগজ চালাবার সাহস করেছে সে। ঘুরে ঘুরে টাকা যোগাড় করেছে ধরে ধরে বড়লোক বন্ধুদের বানিয়েছে অংশীদার। তারপর কাগজ খুলেছে। একাদিক্রমে চালিয়েছে তিন-চার বছর। অনেক লোকের অন্নসংস্থান হয়েছে, জনকতক বেকার সাংবাদিকের জুটেছে চাকরি। মনে মনে প্রশংসা করেছে সে শ্রীপতি দত্তের। সুদর্শন এমন পারত না, এমন শক্তি তার নেই।

কিন্তু শক্তি থাকলেই কেন লোকে অপব্যবহার করে, অর্থ দেখলেই কেন লোভ হয় মানুষের? সুদর্শন ভিতরে ভিতরে টের পেয়েছে অগ্রদূতের এই অবনতি আর পশ্চাদ্‌গতির মূলে অন্য সব অংশীদারদের অংশ কিছু-কিছু থাকলেও সব চেয়ে বেশি দায়িত্ব রয়েছে শ্রীপতি দত্তের।

সুদর্শন আমাকে বলল, 'সেদিন আর রাগ সামলাতে পারিনি। মুখের উপরই শুনিয়ে দিলাম কাটা-কাটা কথা।'

অবাক হয়ে বললাম, 'তোমার মত মুখচোরা মানু কাটা-কথা শুনাতে পারল? লজ্জায় মাথা কাটা গেল না?' আমার পরিহাসে সুদর্শনের মুখে একটু যেন বেদনার ছাপ পড়ল, বলল, 'না। শান্ত মুখচোরা মানুষরা চুরির জন্য নিজেদের কম শাস্তি দেয় না কল্যাণ। মুখের সামনে অন্যায়ের প্রতিবাদ না করায় যে অন্যায় হয়, সেই অন্যায়ের জন্য

তারা পাওনার চেয়ে নিজেদের বেশি শাস্তিই দেয়। আড়ালে এসে নিজেদের মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে। মাথাটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলেই যেন ভালো হয়। কিন্তু সেদিন পারলাম। কি ক'রে পারলাম এখন নিজেরই বিশ্বাস হ'তে চায় না। কলমের মুখ থেকে যেমন অনেক সময় আপনিই লেখা বেরোয়, আমার মুখ থেকেও সেদিন পৃথিবীর সমস্ত কটু কথা আপনিই বেরিয়ে এল।'

কি কি কথা বেরিয়েছিল তা আর আমার কাছে পুনরাবৃত্তি করল না সুদর্শন। আমি ওকে করতে বললামও না। ও. না বললেও নিজেদের অফিসে বসে আমি একটু একটু শুনেছিলাম। একরোখা, বলিষ্ঠ চেহারার শ্রীপতি দত্ত কেবল মুখের কথার মানুষ নয়, সুদর্শনের কথা শুনে সে আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এসেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল দরজার সামনে আরো বিশ-পঁচিশটি কম্পোজিটার আস্তিন গুটাচ্ছে।

শ্রীপতি তখন বলল, 'যান, কাজ করুন গিয়ে।' পরদিন মাথা ঠাণ্ডা করে শ্রীপতি সুদর্শনকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিল, আপনার টেম্পারামেণ্ট স্যুট্ করছে না, বলেই তো আপনি এখান থেকে চলে যেতে চাইছেন সুদর্শনবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ?'

'শ্রীপতি বলল, 'তাই যান। এ আপনার যোগ্য স্থান নয়। দেখছেন তো কোম্পানীর অবস্থা, কাগজের অবস্থা, তবু আমি আপনার বাকি মাইনের সব না পারি বারো আনি শোধ করে দিচ্ছি। যা বাকি রইল, তাও আপনি মাসখানেকের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আমি নিজেই লোক দিয়ে আপনার বাসায় পাঠিয়ে দেব। আপনাকে কষ্ট ক'রে আর আসতে হবে না।'

সুদর্শন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আর কম্পোজিটাররা? অন্য সব সাব-এডিটররা! তাদেরও তো ওই একই কথা। তারাও তো বেশীর ভাগ মাইনে পেলেই চলে যায়।'

শ্রীপতি একটু হাসল, 'আপনি বড় অবুঝের মত কথা বলছেন.

সুদর্শনবাবু, সবাই চলে গেলে আমার কাগজ চলবে কি করে? যেমন ক'রেই হোক সামনের ইলেকসন পর্যন্ত কাগজ আমাকে রাখতেই হবে। তারপর ফের নিশ্চয়ই দিনের নাগাল পাব। আপনাকেও তখন ডেকে আনতে পারব। কিন্তু এখন এই ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থেকে আর দরকার নেই আপনার। বাড়ী বসে বসে ফীচার লিখুন সেই ভালো।'

সুদর্শন বলে এসেছিল—'অসম্ভব, আমি তা পারব না।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদর্শন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, অথচ মজা এই কল্যাণ, এর আগে কত সামান্য কারণে যে চাকরি ছেড়েছি তার আর ঠিক নেই। ওপরওয়ালার সঙ্গে সামান্য কথান্তর হোল—ছেড়ে দিলাম চাকরি, বার কয়েক বলবার পরেও দু'খানা দরকারী ডিক্‌সনারী কেনা হোল না, কি চাবী হোলনা আমার দেরাজের—অপমান বোধ করে ছেড়ে দিলাম চাকরি। কিন্তু আজ শ্রীপতি দত্ত ছাড়াতে চাইলেও, চূড়ান্ত অপমান করলেও আমি আর ছেড়ে আসতে পারি না, আমার মন ওখানে থাকতে না চাইলেও আমাকে থাকতে হবে। নিজের প্রাপ্য টাকাকে ঘুষের টাকার মত ক'রে আমি নিতে পারি না। পারি স্বস্তি?'

স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুদর্শন আমার সামনেই পরম স্নেহসিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'পারি নিতে? তুমিই বল' পারি?'

স্বস্তি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। মাথা নীচু ক'রে চুপ ক'রে রইল। কখন আঁচল পড়ে গেছে মাথার, এলো খোঁপা পিঠের ওপর ভেঙ্গে পড়েছে সেদিকে খেয়াল নেই।'

একটু বাদে স্বস্তি মুখ তুলে বলল, 'না, তাও তুমি পার না। কিন্তু ও টাকা ছেড়ে দিয়ে আসতে তো পার? যতদিন ও টাকার আশায় আশায় থাকবে, ততদিন অন্য একটা ভালো জায়গায় চাকরি খুঁজে নিতে পারবে।'

সুদর্শন পরম দুঃখে হাসল, 'না তাও আর পারি না। তাছাড়া ভালো জায়গা আর কই স্বস্তি? এখানে সব জায়গাই এক জায়গা।'

স্বস্তি আর কোন কথা না বলে ভিতরের দিকে চলে গেল।

আমরা বেরুলাম বাইরে।

সুদর্শন বলল, 'আজ আর তোমাকে চা দিতে পারলাম না কল্যাণ। চল আজ তুমিই চা খাওয়াবে। চা-টা বোধ হয় চেয়ে খাওয়া যায়।'

বলেই সুদর্শন একটু হাসল, 'তোমার শব্দালঙ্কার আমাকেও পেয়ে বসল বোধহয়। কিন্তু অলঙ্কারের লোভ মাত্রেই খারাপ। যেমন মেয়েদের পক্ষে, তেমনি লেখকদের পক্ষে। ওতে কেবল নিজেরই চরিত্র নষ্ট হয় না, লেখকের সব চরিত্রের চরিত্রদোষ ঘটে। যেমন তুমি আমার ঘটাচ্ছ।' বললাম, 'তা আমি জানি সুদর্শন, খুব ভালো করেই জানি, তবু নিজের কলমের মুখ বন্ধ করতে পারি না। ও যেন কি ক'রে উড়ে গিয়ে প্রত্যেকের মুখে মুখে জুড়ে বসে থাকে।'

সুদর্শন হাসল, 'উড়তে দিয়ো না। ওর ডানা কেটে দাও। ও মাটি দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াক। আমার অধ্যাপক একদিন বলেছিলেন, হয়ে হয়ে লিখতে হয়। তোমাকে দেখে মনে হয় তা বরং সহজ। কিন্তু ঢের কঠিন সেই সঙ্গে না হয়ে হয়ে লেখা। একই সঙ্গে হ'তেও হবে, আবার না হ'তেও হবে। সে বড় শক্ত কাজ ভাই।'

দুজনে এসে মোড়ের চায়ের দোকানটায় বসলাম একটা ক'রে। টোষ্ট আর চপ নিতে যাচ্ছিলাম, সুদর্শন বাধা দিয়ে বলল, 'শুধু চা নাও।'

'আর কিছু দরকার নেই ?'

সুদর্শন মাথা নাড়ল, 'না, আর কিছুর দরকার নেই।' আমি অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, 'আমি জানি দরকার থাকলেও তুমি কিছু নেবে না। কিন্তু এও তোমার এক ধরণের অহংকার সুদর্শন। সংসারে নিতেও হয়, দিতেও হয়। তুমি কেবল হাত উপুড় করবে—হাত চিৎ করবে না, এই বা কি কথা।'

সুদর্শন একটু হাসল, 'তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু তোমার এই বাজে দোকানের পচা চপ খেয়ে শরীর খারাপ করব না। আর একটা কথা কি জানো কল্যাণ, চার্বাকের মতে ঋণ করে ঘি খাওয়া বরং ভালো, কিন্তু শাকান্ন খাওয়া ভালো নয়। সে ঋণ জীবনে আর শোধ হয় না।'

একটু বাদে চা খেতে খেতে বললাম, 'আমার মনে হয় কি সুদর্শন, তোমার বিয়ে না করাই ভালো ছিল। বেশ তো ছিলে, কেন আবার মিছিমিছি একটা বিয়ে করতে গেলে?'

সুদর্শন বলল, 'করব না বলেই তো ঠিক ছিল। কিন্তু জ্যোতিষ চর্চা করতে গিয়ে কাণ্ডটা ঘটে গেল। আমার হাত দেখার 'হবির' কথা জানো তো?'

বললাম, 'জানি! তুমি অমনিতে মিথ্যা কথা বল না। কিন্তু তোমার ওই 'হবি' তোমাকে মিথ্যা কথা বলায়। যা বল, তার কিছু ফলে না।'

সুদর্শন হাসতে লাগল। একটু বাদে বলল, 'সবই যে একেবারে বিফল হয়, তা নয়। আমি ইচ্ছা করে অশাস্ত্রীয় কিছু বলি না। কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কল্যাণ, যত অবিশ্বাসীই এসে হাত পাতুক, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। হাত ভালো বললে তার মন ভালো হয়, সে দিনটা অনন্ত ভালো কাটে।'

'কিন্তু সেই জন্য তুমি মিথ্যা আশা দেবে লোককে?'

সুদর্শন বলল, 'তা দিতে যাব কেন। তা আমি দিই না। একবার দিতে গিয়ে তার ফল হাতে হাতে পেয়েছি।'

'ব্যাপারটা কি?'

কুমিল্লা থেকে এসে অধ্যাপকের সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছিল সুদর্শন। একটি-দুটি বছর নয়, পুরো দশ বছর। রসের পথ নয়, রূপের পথ নয়, শুধু জ্ঞানের পথ। বাপের ধমক শোনে নি, মার অনুরোধও নয়। অনেক পিতৃবন্ধুকে আর মার দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দের ক্ষুণ্ন করেছে। তাতে বাবা নিজেও কম ক্ষুণ্ন হননি, বলেছেন, পরের বউকে নিয়ে কবিতা লিখতেই আমি তোকে না করেছিলাম। ঘরে তো বউ আনতে নিষেধ করিনি। তুই কি এমন করে তার শোধ তুলবি।'

সুদর্শন সবিনয়ে বলেছিল, 'সে জন্য নয়। নিজে আগে স্থির হয়ে নিই, তারপর ও সব কথা ভাবব।'

তবু মন যে মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে না উঠত তা নয়। একেক সময় মনে হোত পথটা শুকনো মরুভূমির ভিতর দিয়ে গেছে। তপ্ত বালুতে পুড়ে যাচ্ছে পা। সে জ্বালা সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। তবু মনটা ক্রমে শক্ত হয়ে উঠেছিল সুদর্শনের। জ্বালা পুড়াবার জন্য সে পৃথিবীর কবিদের কাছে গেছে। ঘটকের দ্বারাস্থ হয়নি।

তবু অঘটন ঘটল।

সেবার প্রাক্তন এক সহপাঠী বন্ধুর সঙ্গে সুদর্শন দেশে যাচ্ছিল। কুমিল্লার গোটা তুই ষ্টেশন আগে প্রিয়তোষ সেন কেবল নিজেই নামল না, জোর করে বন্ধুকেও নামিয়ে নিল। ষ্টেশনেরই লাগা সুপারি নারকেলের সার ঘেরা ছোট গ্রাম, আর সেই গ্রামেরই দক্ষিণ প্রান্তে মাঠঘেঁষা বাড়ী।

প্রিয়তোষ বলল, 'আমার মামা বাড়ী। আজ রাত্রে এখানে ঘুমিয়ে কাল সকালের গাড়ীতে এক সঙ্গে কুমিল্লায় চলে যাব।'

খুব যে অনিচ্ছুক হোল, অখুসি হোল সুদর্শন, তা নয়। একটানা শহরে থেকে থেকে মনটা গ্রামের জন্য ওর উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। ভাবল, একটা রাত্রের তো ব্যাপার, ক্ষতি কি।

ঢেউ খেলানো করোগেটেড টিনের সাতাশের বন্ধের ঘর। চালের উপর বড় একটা জামরুল গাছ নুয়ে পড়েছে। জং ধরেছে একখানা টিনে। প্রিয়তোষের মামা সেই টিনখানাও বদলান নি; জামরুল গাছের মোটা ডালটা কেটে ফেলতেও বোধ হয় তাঁর মায়া হয়েছে। ভোর বেলায় একটু ঘুরে বেড়িয়ে এসে বারান্দায় পাতা তক্তপোষ খানার ওপর বসল সুদর্শন। সবে রোদ উঠেছে, সামনের সুপারি গাছটার পাকা পাকা সুপারিগুলির ওপর লালচে রোদ এসে লেগেছে।

প্রিয়তোষের সবচেয়ে ছোট মামাত বোনটি নতুন বেতের সাজিতে ক'রে নারিকেল কোরা আর চিনিতে মিশিয়ে এক রাশ গরম মুড়ি এনে সামনে দাঁড়াল।

সুদর্শন বলল, 'এত কে খাবে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'আমি আছি কি জন্য। আমারও ভাগ আছে ওতে।'

থাবায় থাবায় মুড়ি চালাতে লাগল প্রিয়তোষ। সুদর্শনেরও খারাপ লাগল না।

তারপর প্রিয়তোষ ওর মামাত ভাইবোনদের ডেকে ডেকে বলল, 'এই সুধা, শান্তি, অন্তু, পন্তু তোমাদের হাত দেখা হবে। জানো মামীমা, আমাদের সুদর্শন চমৎকার হাত দেখতে জানে।'

মামীমা বললেন, 'তাই না কি ?'

প্রিয়তোষের মামা বাজারে যাচ্ছিলেন, তার মামীমা ব'লে দিলেন, 'ভালো মাছ এনো।'

প্রিয়তোষ বলল, এসো মামীমা, তোমার হাতই আগে দেখাই।'

সুদর্শন বলল, 'কি ছেলেমানুষী করছ।'

মামীমা বললেন, 'আমার হাতের আর কি দেখাবে প্রিয়তোষ, আমার ভাগ্যতো প্রায় দেখাই হয়ে গেছে।'

প্রিয়তোষের মামা স্থানীয় মুনসেফ কোর্টে ওকালতি করেন। কিন্তু মক্কেলরা বড় একটা কেউ খোঁজ করে না। মামীর মনে সেই আফশোষ।

'বরং ছেলে মেয়েদের হাত দেখাও প্রিয়তোষ, ওদের কি রকম বিদ্যা বুদ্ধি হবে শোন।'

প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য জ্যোতিষ দুই-ই একটু একটু নেড়ে চেড়ে দেখেছিল সুদর্শন। সেই বিদ্যায় ছোট ছোট হাতগুলির রেখা বিচার করতে লাগল। মোটামুটী সবাইরই বেশ ভালো হাত, সবাই বিদ্বান হবে, বুদ্ধিমান হবে, ভালো ঘর বর হবে শুধা শান্তির।

কিন্তু তারপরই আর একখানা হাতকে সামনে নিয়ে এল প্রিয়তোষ, 'এবার ওর হাতখানাও একটু দেখে দাও।'

এক গাছা চুড়ি পরা গৌরবর্ণ সুগঠিত, সুন্দর হাত। এ হাত দেখে আর একখানা হাতের কথা মনে পড়ল সুদর্শনের। সে হাত সে দূর থেকে দেখেছিল। ধরেনি শুধু ধরবার গল্প লিখেছিল, তাতেই ধরা পড়ে গেল, কিন্তু ধরতে পারল কি ?

চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল সুদর্শন। আরক্ত মুখখানা তখন ফিরিয়ে নিয়েছে মেয়েটী।

'আঃ ছেড়ে দাও প্রিয়দা, কি হচ্ছে। আমার হাত দেখাবার দরকার নেই।'

মৃদু লজ্জিত কণ্ঠ শোনা গেল ওর।

কিন্তু প্রিয়তোষ নাছোড়বান্দা। স্বস্তির ভাগ্য সে সুদর্শনের কাছ থেকে জেনে নেবেই। সুদর্শনের দরকার না থাকতে পারে, স্বস্তির দরকার না থাকতে পারে, কিন্তু দরকার আছে প্রিয়তোষের আর তার মামা মামীর।

ওর ছোট ভাইবোনদের হাত যেমন নিজের হাতে নিয়ে দেখেছিল সুদর্শন, স্বস্তির হাত ঠিক তেমন ক'রে নিল না। প্রিয়তোষ সেই হাতখানা ওর চোখের সামনে মেলে ধরল।

কিন্তু জ্যোতিষীর চোখ প্রসন্ন হোল না সে হাতের ঘন রেখাজালের বিস্তারে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুচ্চারিত রইল খানিকক্ষণ। কিন্তু পরক্ষণেই মন ঠিক ক'রে ফেলল সুদর্শন। ভবিষ্যৎ ওর যাই হোক বর্ত্তমানে ওকে অখুসি করবে না, আঘাত দেবে না ওর মনে।

সুদর্শন প্রিয়তোষকে বলল, 'এ হাতও ভালো।'

প্রিয়তোষ বলল, 'ভালো তো বুঝলাম। কেমন হাতে গিয়ে পড়বে তাই বল।'

সুদর্শন বলতে লাগল, 'সে হবে সরল, সত্যবাদী, বিদ্যানুরাগী।'

জ্যোতিষী ছেড়ে দিয়ে মনের কল্পনা থেকে সেই ভবিষ্যৎ পুরুষ সম্বন্ধে আরো অনেক কথা ব'লে গেল সুদর্শন, তারপর বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। গাড়ীতে উঠে প্রিয়তোষ হেসে বলল, 'স্বস্তির ভবিষ্যৎ স্বামীকে আমার মামা মামী চিনতে পেরেছেন, স্বস্তিরও চিনতে বাকি থাকে নি।'

প্রিয়তোষ আবার হেসে বলল, ধরা পড়ে গেছ ভাই। আর জো নেই এড়াবার। এতক্ষণ যার আকৃতি প্রকৃতির বর্ণনা করলে, সে তো তুমি।'

সুদর্শন অনেক আপত্তি করল, প্রতিবাদ করল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোলনা। সুদর্শনের বাবা মা পর্যন্ত যোগ দিলেন প্রিয়তোষের ঙ্গে। তারপর দৈবের ওপর না হোক, দৈবজ্ঞের ওপর জয়ী হোল ওদের পুরুষকার। সে জয়ে সুদর্শনের যে একেবারেই সায় ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে।

একটু কাল চুপ ক'রে থেকে আমি বললাম, 'কিন্তু জ্যোতিষী অমন সুন্দর একখানা হাত দেখে প্রথমে খুসি হয় নি কেন?'

সুদর্শন হেসে বলল, 'তা আমি তোমাকে বলব না। তোমার তো জ্যোতিষে বিশ্বাস নেই।'

আমিও হাসলাম, 'তোমারই যেন কত আছে। বলই না— শুনি।'

সুদর্শন বলল, 'স্বস্তির হাতে ছিল ওর স্বামী ভালো হবে না। হবে দুর্বল, হবে পরশ্রীকাতর, ভিতরে ভিতরে আরো কত যে অসদগুণ তার থাকবে তার ইয়ত্তা নেই।'

বললাম, 'ওঃ কি ফাঁড়াই না তাহ'লে গেছে। তুমি তাহ'লে একটি শান্ত সুন্দরী বুদ্ধিমতী মেয়েকে সেই অসৎ লোকটার হাত থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করেছ বল।'

সুদর্শন আমার দিকে মুহূর্তকাল চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলল, 'সম্পূর্ণই যে পেরেছি, তা তোমাকে কে বলল। সেই অসৎ লোকটা একেবারেই যে গেছে তা তো নয়। এখনো ওর ভাগ্যের সঙ্গে পুরুষকারের পাল্লা চলেছে কল্যাণ। এখনো তো বেশীর ভাগ সময় সেই অসৎ লোকটাই বার বার ওপরে উঠে আসছে। আর না হয়, ভিতর থেকে উঁকি মারছে।'

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে আমরা লোয়ার সার্কুলার রোডে পড়লাম।

একটুকাল চুপচাপ হাঁটবার পরে আমি বললাম, 'এটা তোমার অতি বিনয় সুদর্শন। তোমার মত ভাল লোক আমি তো আর দেখিনি। তোমার সামনেই বললাম। এটা আমার তোষামোদও নয়, বন্ধু প্রীতিও নয়; ভালো কে ভালো বলতে পারার আনন্দ।'

সুদর্শন আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'তা আমি জানি কল্যাণ, তা আমি বিশ্বাস করি। সেই ভালো লাগার আনন্দে, ভালো বলার আনন্দেই তুমি অত ভালো বলতে পারছ, না হ'লে সত্যি সত্যিই অত ভালো আমি নই। আমি একান্তই সাধারণের মত, সাধারণের চেয়েও নীচে। আরও পাঁচজনের মত হিংসা ঈর্ষা, রাগ, অনুরাগ কিছুই বেশী ছাড়া কম নেই। ভিতরের সেই মানুষটাকে আমিতো জানি। কিন্তু তাকেই একমাত্র বলে মানিনা। আজ তুমি ভালো বলার আনন্দে ভালো বলছ। কিন্তু সকলেই তো আনন্দ থেকে বলে না, শ্লেষ ক'রে, ব্যঙ্গ ক'রে, পরিহাস করেও বলে। তখন আমারও রাগ হয়, দুঃখ হয়, ভালো হ'য়ে অনুশোচনা হয়।'

বললাম, 'সত্যি? তাও হয় তোমার?'

সুদর্শন বলল, 'কেন হবে না, নিশ্চয়ই হয়। আবার তোমরা যখন খুসি হও, আনন্দ পাও তখন আমারও ভালো লাগে। লজ্জা পেয়ে ভাবি কেন আরো ভালো হ'তে পারলাম না। কেন যোগ্য হ'তে পারলাম না তোমাদের ভালো ধারণার। তোমরা যা আমি তো তাছাড়া আর কিছু নই।'

হাঁটতে হাঁটতে আমার অফিসের সামনে এসে পড়লাম। ভিতরে ঢুকবার আগে থেমে দাঁড়ালাম একটু।

সুদর্শন বলতে লাগল, 'আসলে আমাদের ভালো বলার আনন্দ, ভালো লাগার আনন্দ, ভালো হওয়ার আনন্দটাই সত্যি। সেই আনন্দেই আমরা একজন আর একজনকে ভালো দেখি, ভালো দেখতে চাই। সে চাওয়ার জোয়ার ভাঁটা আছে, হ্রাস বৃদ্ধি আছে। এক এক সময় অবশ্য মনে হয় সে চাওয়ার জোর আর নেই। সে ইচ্ছা একেবারে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তা যায় না কল্যাণ, একেবারে যায় না। আর যায় না বলেই, এত আশা থাকে।'

আশা থাকলেও 'অগ্রদূত' অফিস আর থাকল না। লিকুইডেশনে গেল। মাঝখান থেকে টাকাগুলি মারা গেল সুদর্শনের। এক পয়সাও আদায় হোল না।

কাগজে কাগজে ফিচার আর প্রবন্ধ লেখে সুদর্শন; বলে, "বেশ আছি।'

কিন্তু কি রকম বেশ আছে তা শুধু ওর আধ ময়লা ধুতী পাঞ্জাবীতেই ধরা পড়ে তাই নয়, ওর শীর্ণ, শ্রান্ত, উদ্বিগ্ন মুখেও মাঝে মাঝে অস্তিত্বের রূপটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পূজোর মরশুমে তুজনে প্রাণপণে পাল্লা দিয়ে লিখছি। ও প্রবন্ধ, আমি গল্প! ঠিক প্রাণের আনন্দে নয়, প্রাণের দায়ে। কেবল প্রাণ রক্ষার জন্যও নয়, ছু' একজন বন্ধুর মন রক্ষার জন্যও।

দেখাও হ'ল 'বন্দনা' মাসিক কাগজের অফিসে। সম্পাদক গোষ্ঠীদের কেউ আর নেই। সুদর্শন তার লেখা দিয়েছে, আমি তখনও দিতে পারি নাই। তাই নিয়ে একটু চিন্তাগ্রস্থ। বললাম, 'এবার কি নিয়ে লিখলে। বন্দনা'র ভাদ্র সংখ্যায়ও সংস্কৃতির উপর তোমার প্রবন্ধটি বেশ হয়েছিল।'

সুদর্শন বলল 'তাই নাকি।'

কিন্তু প্রসঙ্গটা সঙ্গে সঙ্গে পালটে নিয়ে বলল, তোমার নতুন গল্প লেখা হোল?' বললাম 'না।'

'কেন, তোমার তো অনেক প্লট আছে মাথায়।'

বললাম 'তা আছে। কিন্তু সব জট পাকানো। মাথার ওপরের জটা নয়, ভিতরের জট।'

সুদর্শন খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, আজ একটা গল্প দেখলাম। কিন্তু তোমার কোন কাজে লাগবে না, বড় পুরোণ গল্প।'

'বলই না শুনি। গল্প মাত্রেই পুরোণ কথা। শুধু মুখ আর কান নতুন নতুন হয়।

সুদর্শন একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'মিনতির সঙ্গে আজ দেখা হোল।'

'সে কি, কোথায় কি বৃত্তান্ত শিগ্‌গির বল।'

'অমন উল্লসিত হবার কিছু নেই।'

'বেশতো ম্রিয়মান হয়েই শুনছি। তবু বল তুমি।'

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে কিছুদিন আগে মিনতিরা চলে এসেছে

কলকাতায়। বাসা পেয়েছে টালিগঞ্জে। সুদর্শনের কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, হঠাৎ দৈনিক কাগজের পুজো সংখ্যায় ওর নামের বিজ্ঞাপন দেখে ফের মনে পড়ল। স্বামীকে বলল, 'সুদর্শনদার একটু খোঁজ নিতে পার?'

'তা পারা যাবে না কেন। লোকটি কে?'

'কুমিল্লারই লোক। বাবার ছাত্র ছিল।'

সুদর্শনের সেই গল্পের কথা শীতাংশু হালদারের কানে যায়নি। সরোজিনী সে দিক থেকে খুবই সতর্ক ছিলেন। মেয়েকেও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভালো ক'রে।

স্ত্রীর কৌতূহলকে নিতান্তই স্ত্রীসুলভ কৌতূহল ছাড়া শীতাংশু অন্য কিছু ভাবতে পারল না। কিন্তু এসব ছোটখাট কৌতূহলকে মাঝে মাঝে না মোটালে এমন সব কৌতূহল এসে জোটে যা মিটাবার আর সাধ্য থাকে না। দৈনিক কাগজের অফিসে ফোন করে ঠিকনাটা জোগাড় করল শীতাংশু। তারপর সুদর্শনকে পাকড়াও করল তার বাসায় গিয়ে। বেঁটে খাট মোটা সোটা ভদ্রলোক। বয়সটী সুদর্শনের মতই হবে। মাথায় টাকের আভাস পড়ায় একটু বেশী দেখায়। পোষ্ট অফিসে ভাল চাকরি করে। পাকিস্তান থেকে গোড়াতেই স্থান বদল করেছিল। কিন্তু স্ত্রীপুত্র সুরুতেই আসেনি। মিনতি কখনো বাপের কাছে ছিল, কখনো শ্বশুরের কাছে। মাস তিনেক আগে টালীগঞ্জে বাসা পেয়ে শীতাংশু ওদের নিয়ে এসেছে।

মিনতির কথা শোনবার আগে তার বাবার কথাই জিজ্ঞাসা করল সুদর্শন।

শ্বশুর সম্বন্ধে শীতাংশুকে খুব উৎসাহী মনে হোল না। বলল, 'তাঁর কথা আর বলবেন না। এত ক'রে বললাম চলুন কলকাতায়। কিছুতেই এলেন না। ওখান থেকে এক পাও নড়বেন না তিনি। চলুন আমার সঙ্গে।'

সুদর্শনের অন্য কাজ ছিল। ঠিক সঙ্গে যেতে পারল না। কথা দিল পরে যাবে।

'এতে আপনার লেখা আছে নাকি ?'

'বন্দনার' ভাদ্র সংখ্যাটা যাওয়ার সময় হাতে ক'রে নিয়ে গেল শীতাংশু।

দিন দুই পরে সকালে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু একখানা বইয়ের সমালোচনা লিখতে লিখতে দেরি হয়ে গেল সুদর্শনের।

চারু এভেনিয়ুতে গিয়ে যখন পৌঁছল তখন পৌনে দশটা বাজে।

দোতলা ফ্লাট বাড়ি। নির্দিষ্ট নম্বরের দরজায় কড়া নাড়তেই ছোট ছোট গুটি তিনেক ছেলে মেয়ে বেরিয়ে এল, তারপর আরো দুটি।

একটি ডেকে বলল, 'মা' দেখ এসে কে এসেছে।'

একটু বাদে ওদের মাও এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে রইল।

সুদর্শনের চেহারার খুব বদল হয়নি। কিন্তু মিনতি বদলেছে অনেক। বেশ মোটা হয়ে পড়েছে। কিন্তু চিনতে কষ্ট হয় না, পীড়িতও হয় না চোখ। পুষ্টতা ওর দেহের দীর্ঘ গড়নের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গেছে।

মিনতি বলল, 'এসো, তোমার তো নটার মধ্যে আসবার কথা ছিল। উনি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে ক'রে এই খানিকক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন।'

ঘরের ভিতরে গেল সুদর্শন। ঘরের মধ্যে দামী খাট তাতে পুরু গদী পাতা।

মিনতি বলল, 'এবার দেশ থেকে আনিয়েছি। ওঁর তেমন ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দেশে যদি গিয়ে কেউ না-ই থাকি, এ সব সেখানে ফেলে রেখে লাভ কি বল তো।'

সুদর্শন বলল, 'তা তো ঠিকই।'

দু'তিনখানা ভালো চেয়ারও এসেছে দেশ থেকে। তারই একখানায় ওকে বসতে বলল মিনতি। ধুলো ছিল না। তবু হাতখানা চেয়ারের গদির ওপর একটু বুলিয়ে নিল। সুদর্শন বসল চেয়ারে।

সামনের দেওয়ালে বড় একখানা গ্রুপ ফটো। স্বামী আর ছেলে মেয়ের মাঝখানে স্মিতমুখী মিনতির প্রতিকৃতি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

চোখ নামিয়ে সুদর্শন দেখল কেবল মিনতির প্রতিকৃতি নয়, মিনতিও চেয়ে রয়েছে তার দিকে।

সুদর্শন জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছ?'

'ভালো। তুমি?'

'ভালো।'

এরপর মিনতি সুদর্শনের স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করল। 'সে কেমন হয়েছে। ছেলে মেয়ে কটি। কোনটি কার মত হয়েছে দেখতে। বাপের মত না মার মত। কেবল মেয়েই হচ্ছে কেন, ছেলে কেন হয় নি।'

শেষ প্রশ্নটি ছাড়া আগেকার প্রশ্নগুলির জবাব দিল সুদর্শন। মিনতির কেবল মেয়ে নয় ছেলেও হয়েছে। পাঁচটির মধ্যে ছেলেই তিনটি। তাদের ডেকে নাম জিজ্ঞাসা করল, আদর করল একটু।

থালায় ক'রে খাবার নিয়ে এল মিনতি। পরোটা আর হালুয়া। কুণ্ঠীতভাবে বলল, 'দেখ জুড়িয়ে গেছে বোধ হয়। কতক্ষণ আগে ক'রে রেখেছি।'

সুদর্শন বলল, 'তাতে কি। কিন্তু এত কে খাবে। কমিয়ে দাও।'

মিনতি বলল, 'এর চেয়ে আর কমাব কি। সামান্যই দিয়েছি খাও।'

ছেলে মেয়েদের হাতে কিছু কিছু তুলে দিতে গেলে মিনতি বাধা দিয়ে বলল, 'আহাহা আর ভদ্রতা করতে হবে না। ওরা এই একটু আগে খেয়েছে। যাও তোমরা ওই ঘরে যাও তো।

অস্থির ছেলে মেয়ের দল পাশের ঘরে চলে গেলে মিনতি কেটলী থেকে রঙীন কাপে চা ঢেলে সুদর্শনের হাতে এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ইয়ে, যদি কিছু মনে না করো তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

সুদর্শন বলল, 'কর।'

তবু একটু ইতস্তত করল মিনতি। ওর ফর্সা মুখ একটু যেন আরক্ত হোল। আর সেই রঙের আভাসে আর একদিনের কথা, আরো অনেকদিনের কথা মনে পড়ে গেল সুদর্শনের।

লজ্জিত ভঙ্গিতে মিনতি বলল, 'তোমার সেই গল্পটির কথা বলছিলাম। সে গল্পটা আর আমি পড়তেই পারলাম না। কিন্তু এখন তো পারি। এতদিন বাদে এতগুলি ছেলে মেয়ে হয়ে যাওয়ার পর এখন তো আর দোষ নেই পড়তে।'

চা খেতে খেতে একটু যেন বিষম খেল সুদর্শন, গলা ঠিক ক'রে নিয়ে বলল, 'দোষ নেই। কিন্তু সে গল্পও তো আর নেই মিনতি।'

মিনতি একটু চুপ ক'রে থেকে বলল 'নেই?'

না।'

মিনতি বলল, 'তার বদলে বুঝি ওই প্রবন্ধ?'

সুদর্শন একটু হাসল, 'হ্যাঁ। 'বন্দনা' থেকে পড়লে না কি প্রবন্ধটা?'

মিনতি বলল, 'প্রবন্ধ আমি কারোরই পড়ি না। প্রবন্ধও না, কবিতাও না। তোমার নাম দেখেই পড়তে গেলাম। অনেকখানি পড়লামও। কিন্তু—'মিনতি একটু হাসল, 'কি যে মাথামুণ্ডু—মানে যত সব শক্ত শক্ত কথা—কিছু বুঝতে পারলাম না।'

কাহিনী শেষ ক'রে সুদর্শন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে রইল।

বললাম,—একটু নির্বোধের মতই বললাম,'দুঃখ পেলে?'

সুদর্শন মাথা নেড়ে বলল, 'না। তুমি যা ভাবছ তা নয়। সে দুঃখ নয়।

'তবে?'

সুদর্শন বলল, ভাবছি সবাইকে যদি না বুঝতে পারলাম তবে লিখলাম কি।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলাম। সবাইকে না বুঝতে পারার দুঃখ, সকলের না বুঝতে পারার দুঃখ, এক সঙ্গে ওর মুখে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

কোন জবাব দিলাম না। কি জবাব দেব?

ও দুঃখ তো সুদর্শনের একার নয়।

॥ সম্ভ্রম ॥

মাসের শেষ। ফার্স্ট ক্লাসে পাঁচটি পয়সা লাগে, সেকেণ্ড ক্লাসে তিন। ঝুল পকেটে একবার হাত বুলিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতেই উঠে পড়লাম। ভিড় ঠেলে কোন রকমে মাথাও গলালাম ভিতরে। বসবার তো ভালো, দাঁড়াবারও জায়গা নেই। ধাক্কা দিতে দিতে ধাক্কা খেতে খেতে উপবিষ্ট যে লোকটির ঘাড়ে এসে পড়লাম, চেয়ে দেখি সে আমাদের সদানন্দ।

আমাদের অফিসের বেয়ারা।

দুজনেই অপ্রস্তুত হলাম।

সদানন্দ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আপনি বসুন।'

আমি বললাম, আরে না-না। তুমি বোসো। তাতে কি হয়েছে। এতো আর অফিস নয়।'

কিন্তু সদানন্দ কিছুতেই আমার কথা শুনল না। আমাকে প্রায় জোর করে ওর সীটে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'নাই বা হলো অফিস। আপনি দাঁড়িয়ে যাবেন, আমি বসে যাব, তাই কি হয়? বসুন আপনি। আমাদের দাঁড়িয়ে যাওয়া অভ্যাস আছে। তাছাড়া আমি একটু আগেই নেমে যাব।'

ট্রামের আরো সব যাত্রী আমাদের এই সৌজন্য বিনিময় দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। আমি আর কোন কথা না বলে ওর আসনে বসলাম। তারপর খানিকটা প্রসন্নকণ্ঠে বললাম, 'ভালো আছ সদানন্দ? সুধা আর ছেলেমেয়েরা সব ভালো আছে তো?'

সদানন্দ ঘাড় নেড়ে সংক্ষেপে বলল, 'আছে।'

ওর সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে মনে পড়ল, কিছুদিন আগে সদানন্দকে আমি বড় কড়া ধমক দিয়েছিলাম। ও বোধহয় সেকথা ভুলতে পারেনি।

অমন কাটা-কাটা কথা বলা সেদিন আমার উচিত হয়নি। মনে মনে একটু লজ্জিতই হলাম। আমি সাধারণতঃ চাকর-বেয়ারাদের সঙ্গে বকাবকি করিনে। কিন্তু সেদিন আমার মেজাজ ঠিক ছিল না। কিছু কাল ধরে ও আমাকে যেভাবে বিরক্ত করতে সুরু করেছিল, তাতে কম লোকই মেজাজ ঠিক রাখতে পারত।

আমাদের ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে সদানন্দ চক্রবর্তীকে বছর দেড়েক আগে আমিই কাজটা জুটিয়ে দেই। তখন কি জানি, এই সৎকাজের ফল হাতে হাতে পাব, হাড়ে হাড়ে ভোগ করব।

সদানন্দ আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। পড়ত আমাদের গাঁয়ের হাইস্কুলেই। অবশ্য আমরা তখন পাশ টাশ করে অনেক আগেই গাঁ ছেড়ে এসেছি। ছুটি-ছাটায়, কালে-ভদ্রে দেশে যাই, ওর বাবা মাধব চক্রবর্তী ছিলেন কুণ্ডুদের তহশীলদার। মিতব্যয়ী হলে কিছু রেখে যেতে পারতেন। কিন্তু যেমন পেটুক ছিলেন, তেমনি মামলাবাজ। যাওয়ার আগে একেবারে ফতুর হয়ে গেলেন।

বহুকাল দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়ায় সদানন্দের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। তাই দেড় বছর আগে ও যখন খুঁজে খুঁজে আমাদের অফিসে এসে দেখা করল, আমি 'প্রথমে ওকে চিনতেই পারিনি।

ওর আত্মপরিচয় আর পিতৃ-পরিচয় শোনার পরে একটু লজ্জিত হয়ে বললাম, 'ও তুমি। চেহারা তো খুবই খারাপ হয়ে গেছে দেখছি। শক্ত অসুখ বিসুখ কিছু করেছিল নাকি?

ছাব্বিশ সাতাশ বছরের জোয়ান। কিন্তু দেহে কোথাও যেন যৌবনের চিহ্ন নেই। চোয়ালপানা মুখ। চোখের নীচে কালি। লম্বা চেহারা, এরই মধ্যে যেন কোল কুঁজো হয়ে পড়েছে।

সদানন্দ মৃদু হেসে বলল, 'না অসুখ-বিসুখ আর কি। বছরখানেক ধরে চাকরি-বাকরি নেই। নানা ধান্দায়—'

সহানুভূতির স্বরে বললাম, 'ও'।

সামনের চেয়ারটায় সদানন্দকে বসতে দিলাম। বেয়ারা মধুকে

ডেকে এক কাপ চা দিতে বললাম। কিন্তু বেকার যুবক শুধু চা পেয়ে খুশি হলো না, আরো কিছু চাইল।

দু-চার কথার পরেই বলল, 'ছেলেপুলে নিয়ে একেবারে মারা গেলাম কিরণদা—আপনাদের অফিসে কিছু একটা ব্যবস্থা করে দিন, আছে নাকি কিছু খালি ?'

বললাম, 'ক্ষেপেছ। এ-অফিসে একটা মাছি পর্যন্ত ছ' মাসের মধ্যে ঢোকেনি, কেরাণী তো দূরের কথা।'

সদানন্দের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে মনে কেমন একটা মমতা হলো: বললাম, 'আচ্ছা, অন্য অফিস-টফিসে বরং চেষ্টা করে দেখব। বলে রাখব বন্ধুদের। পড়াশুনো যেন কোন্ অবধি করেছিলে ?

সদানন্দ বলল, 'ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তার পরেই বাবা মারা গেলেন। সংসারের চাপ এসে ঘাড়ে পড়ল।'

মনে মনে আমি আরও হতাশ হলাম। এস্টাব্লিশমেণ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকরিপ্রার্থী বহু বি-এ, এম-এ'র গাদাখানেক দরখাস্ত পড়ে আছে। এক্ষেত্রে একজন ম্যাট্রিকুলেটের জন্যে আমি কি সুপারিশই বা করতে পারি। অবশ্য মুরুব্বীর জোর থাকলে হয়; কিন্তু সে জোর আমার নেই। তবু মুখে বল-ভরসা না দিলে চলে না। তাই সদানন্দকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, তোমার ঠিকানা রেখে যাও। চেষ্টা-চরিত্র করে দেখা যাবে ঘাবড়িয়ো না, ঘাবড়াবার কি আছে।'

সদানন্দের ঠিকানা আমি আমার পকেট ডায়েরীতে লিখে নিলাম, বেলেঘাটার তালপুকুর লেন।

যাওয়ার আগে সদানন্দ বলল, 'আসবেন কিন্তু। ও আপনাকে বিশেষ করে যেতে বলেছে।'

বললাম, 'ও কে!'

সদানন্দ একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'সুধা। আপনাদের গাঁয়েরই তো মেয়ে।

বললাম, 'ঠিক ঠিক। অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আজকাল খুব গিন্নি-বান্নি হয়েছে, না? বলো একদিন অবশ্যই যাব।'

'কবে যাবেন?'

সদানন্দ জানতে চাইল।

আমি দিন তারিখ ঠিক না করে অনির্দিষ্টভাবে বললাম, 'সুবিধে মত সময় করে একদিন যাব।'

সদানন্দ সেদিনের মত চলে গেল। কিন্তু দুদিন বাদে ফের এসে হাজির; বলল, 'কই, গেলেন না তো?'

বললাম, 'অত তাড়াতাড়ি কি আর যাওয়া যায়? সময় পেয়ে উঠিনি।'

সদানন্দ পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল, বলল, 'সুধা লিখেছে।'

মেয়েলি হাতের অক্ষরগুলির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

'শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কিরণদা, গরীব বলে কি গাঁয়ের মেয়েকে একেবারে ভুলে যেতে হয়? দয়া করে ও'র সঙ্গে আজই আসবেন। কতদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। অনেক কথা আছে। ইতি—

বিনীতা

—সুধা'

অনেক কথা যে আসলে একটিমাত্রই তা বুঝতে বাকি রইল না। সাধ করে ফাঁদে পা দিচ্ছি তাও টের পেলাম। তবু এতদিন বাদে গাঁয়ের মেয়ের আহ্বান একেবারে উপেক্ষা করতে পারলাম না। মনে পড়ল কিশোর বয়সে সুধা বেশ সুন্দরী ছিল দেখতে। সেবার ছুটিতে বাড়ী গেলে ও খোঁজ নিতে এসেছিল, 'কি নতুন গল্পের বই আনলেন দেখি।'

খানকয়েক বাংলা উপন্যাস ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, 'দেখ না, সবই তো নতুন।'

সুধা হেসে বলেছিল, 'নতুন না আরো কিছু। কত বই তো পড়লাম। কেবল মলাটটা নতুন। ভিতরে সব পুরানো গল্প।'

বলেছিলাম, 'তা ঠিক। নতুন গল্প কেবল তোমাকে নিয়েই লেখা হবে।'

'আহা।' বলে সুধা চোখ নামিয়েছিল।

ষোড়শী তন্বীর সেই আনতভঙ্গী আজও আমার চোখে লেগে রয়েছে।

কিন্তু তালপুকুরে গিয়ে দেখলাম, জল একেবারে শুকিয়ে গেছে। এই পাঁচ ছ' বছরে সদানন্দের চেয়েও খারাপ চেহারা হয়েছে সুধার। দেখলে চেনা যায় না। রোগা লিকলিকে দেহ, গায়ের রঙ ফ্যাকাশে, কাঠিসার দুটি ছেলেমেয়ে।

বললাম, 'শরীর এত খারপ হয়ে গেছে যে!' বলে নিজেই অপ্রস্তুত হলাম। এর চেয়ে ভালো থাকবার কথা সুধা-সদানন্দের নয়। জীর্ণ পুরনো বাড়ির একতলা একখানা ঘরে ওরা সংসার পেতেছে। পশ্চিম-দিকে একটি জানালা আছে; কিন্তু গা ঘেঁষে আর একটা তেতলা বাড়ি ওঠায় আলো হাওয়ার পথ নেই। রাত্রির অন্ধকারে ছোট একটি হ্যারিকেন ভরসা। চিমনিতে কাঁচের চেয়ে চূণ আর কাগজের অংশই বেশি।

তবু বাক্স থেকে কুমারী বয়সের হাতে-বোনা আসন বের করে আনল সুধা। হালুয়া করল, চা করল। পাতের কাছে বসে ছ' বছরের গার্হস্থ্য জীবনের ইতিহাস কয়েক মিনিটের মধ্যে শুনিয়ে দিল। বিয়ের পরেই পাকিস্তান। কলকাতায় এসে ট্যাংরা অঞ্চলে বাপের সঙ্গে একান্নে ছিল। মা মারা যাওয়ার পর তার ওপরই ভার পড়েছিল সংসারের, কিন্তু দাদা বিয়ে করার পরে সেখানে আর ঠাঁই হলো না, মাস কয়েকের মধ্যেই খিটিমিটি সুরু হয়ে গেল। কারণ সদানন্দের রোজগার কম, খরচ বেশি। শেষ পর্যন্ত আর টিকতে না পেরে সুধা আলাদা বাসা করেছে; কিন্তু সদানন্দ কি তার মান-সম্মান রাখতে দেবে? কম্পাউণ্ডারী থেকে মাষ্টারী, না করেছে হেন কাজ নেই। কিন্তু হাড়িতে আর তার কালি পড়ল না। অবশ্য দোষ কেবল সদানন্দেরও নয়। বিনে মাইনেয়, আধা মাইনেয় লোকে আর কতকাল খাটতে পারে।

চায়ের পর ছোট একটি পানের খিলি হাতে দিয়ে সুধা বলল, 'সবই তো দেখে-শুনে গেলেন, এবার আপনিই ভরসা। ধরবার মত আমাদের জানাশোনা আর কেউ নেই কিরণদা।'

চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল সুধার। গলাটাও যেন একটু ভিজে ভিজে মনে হলো। আমি শুকনো গলায় বললাম, 'আচ্ছা দেখব, চেষ্টা করে।'

তারপর থেকে প্রায় রোজই যেতে লাগল সদানন্দ। তাগিদে তাগিদে আমাকে অতিষ্ঠ করে তুলল।

দুমাসের মধ্যে কিছুই করে উঠতে পারলাম না। সদানন্দ একদিন এসে মরিয়া হয়ে বলল, 'একটা বেয়ারাগিরি আমাকে অন্ততঃ দিন।'

বললাম, 'বল কি হে—শেষ পর্যন্ত বেয়ারাগিরি! সেটা কি ভালো হবে!'

সদানন্দ বলল, 'খুব ভালো হবে কিরণদা, না খেয়ে মরার চেয়ে বেয়ারাগিরি ঢের ভালো!'

ওর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত আমি একটা বেয়ারার কাজই ওকে ঠিক করে দিলাম। ভাতাটাতা নিয়ে টাকা পঞ্চাশেক হবে। একেবারে বেকার থাকার চেয়ে মন্দ কি!

সদানন্দ বলল, 'আপনার বোনকে যেন কথাটা বলবেন না, শুনলে বড় দুঃখ পাবে।'

বললাম, 'আমি কেন বলতে যাব। তুমি না বললেই হলো।'

যতদূর সুব্যবস্থা করা সম্ভব, সবই করলাম। আমি যে রুমে বসে কাজ করি সে রুমে সদানন্দকে রাখলাম না। এসটাব্‌লিশমেণ্টের বিনয়বাবুকে বলে-কয়ে রেকর্ডস সেকসনে ওর কাজ ঠিক করে দিলাম। সহকর্মীদের অনুরোধ করলাম সদানন্দকে দিয়ে যেন চা পান, বিড়ি তাঁরা না আনান। ম্যাট্রিক পাশ বামুনের ঘরের ছেলে নেহাৎই পেটের দায়ে বেয়ারার কাজে নেমেছে। ওকে যেন একটু খাতির করেন তাঁরা। অনেকেই সাধারণমত আমার অনুরোধ রাখলেন।

কিন্তু সদানন্দের চিত্তে আনন্দ নেই, মনে সন্তুষ্টি নেই। অফিসে

মাঝে মাঝে দু-একটি কেরাণীর পদ খালি হয় আর সেই শূন্য চেয়ারের দিকে লুব্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে সদানন্দ। শুধু তাকিয়েই যে ক্ষান্ত থাকে তা নয়, আমাকে এসে আঁকড়ে ধরে, 'হীরেনবাবুর জায়গায় আমাকে ঠিক করে দিন। শুনেছি তিনিও তো ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন। আমি ওর কাজ সব করতে পারব।'

এক আধবার চেষ্টা যে না করলাম তা নয়। কিন্তু বিফল হয়ে আমার নিজের মেজাজও বিগড়ে গেল। রাগ করে বললাম, 'কেন, আমাকে জ্বালাতন করছ সদানন্দ। এখানে যারা একবার টুলে বসে তারা আর চেয়ারে উঠতে পারে না। তোমার যদি এ অফিসে না পোষায় কলকাতায় আরো তো শত শত অফিস আছে—'

সদানন্দ কাতরভাবে বলল, 'কিন্তু আপনি যদি ভালো করে চেষ্টা করেন কিরণদা—'

চটে উঠে বললাম, 'আমি হাজার চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। তুমি নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছ, তখন মনে ছিল না? তখন পারলে না দুটো দিন সবুর করতে?'

সদানন্দ বলল, 'কি করে করব কিরণদা!'

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, 'অমন বার বার কিরণদা কিরণদা করতে হবে না। এটা অফিস, অফিসের বাইরে দাদা কেন ঠাকুরদা বলেও ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে ডাকতে পার। কিন্তু—'

সদানন্দ এক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলেছিল, 'আর আমার ভুল হবে না কিরণবাবু।'

তারপর থেকে পারতপক্ষে সদানন্দ আমার মুখোমুখি হয়নি। চাকরির উন্নতির জন্যে অনুরোধও করেনি। সুধার টুকরো চিঠিও একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে।

বেয়ারাগিরির কথা স্ত্রীর কাছে প্রথম প্রথম সদানন্দ খুলে না বললেও মাইনের পরিমাণ দেখে সুধার বুঝতে দেরি হয়নি। কিছুদিন চুপ চাপ থেকে সুধা ফের আমাকে ছোট ছোট চিঠি লিখতে সুরু করেছিল। আমি তাদের জন্যে যা করেছি তাতে সুধার কৃতজ্ঞতার

সীমা নেই। কিন্তু আর একটু কষ্ট করে শিক্ষিত ভদ্রলোকের কাজ যেন সদানন্দকে জুটিয়ে দেই। আর একটি অনুরোধ সুধার বাপ ভাই কি অন্য কোন পাড়াপড়শীর সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তাহলে আমি যেন বলি আমাদের অফিসে ছোটখাট কেরাণীর কাজই সদানন্দ করছে। নইলে কারো কাছে সুধার মুখ থাকবে না। আর সময় পেলে দয়া করে যেন সুধাদের ওখানে আমি একবার যাই। আমার সঙ্গে তার অনেক কথা আছে।

আমি দ্বিতীয়বার ফাঁদে পা দেইনি। লিখে সুধার কোন চিঠির জবাবও দেইনি। সদানন্দকে ডেকে মুখে বলে দিয়েছি, সুধাকে বলো আমার কাছ থেকে কোন কথা ফাঁস হবে না। এখন ভারি ব্যস্ত, যাওয়ার সময় নেই, পরে এক সময় দেখাসাক্ষাৎ করা যাবে।'

তারপরেও সুধা বিরক্ত করতে ছাড়েনি। মাঝে মাঝে আগের মতই টুকরো চিঠি ছাড়ত। লিখত, 'শুধু মানসম্মানের কথাই তো নয়। খাওয়াপরার কথাও যে আছে। পঞ্চাশ টাকায় চার-চারটি মানুষে আজকালকার দিনে কি বা খায়, কি বা পরে সে কথাটা একটু বিবেচনা করে দেখবেন।'

আমি বিবেচনা করে কি করতে পারি তা সুধাকে বুঝাই কি করে।

কিন্তু সদানন্দের সঙ্গে আমার সেই কথান্তর হওয়ার পর আর বেশি বোঝা বুঝির দরকার হলো না। সদানন্দ মুখ বুজে রইল, সুধাও সব বুঝে কলম বন্ধ করল।

তারপর সদানন্দের সঙ্গে মুখোমুখি আমার এই প্রথম দেখা।

কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম এসে থামতেই আমার পাশের অপরিচিত ভদ্রলোক উঠে গেলেন। আমি সদানন্দকে ডেকে বললাম, 'এসো, এখানে বসো এসে।'

সদানন্দ ইতস্ততঃ করছে দেখে আমি ওকে প্রায় ধমকের সুরে বললাম, 'কথা শোন সদানন্দ। আমি কি তোমার কোন উপকার করিনি যে, সেই একদিনের জ্বালা তুমি চিরদিন মনে পুষে রাখবে?'

সদানন্দ লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না সেজন্যে নয়।' তারপর শান্তভাবে আমার পাশে এসে বসল।

আমি দ্বিতীয়বার কুশল প্রশ্ন করায় সদানন্দ বলল, 'তারা ভালোই আছে। আপনি তো আর এলেন না, আপনাকে যেতে বলেছে একদিন।'

আমি হেসে বললাম, 'সত্যিই বলেছে না তুমি বানিয়ে বলছ? কই আজকাল তো আর সুধা চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রণ করে না।'

সদানন্দ বলল, 'সময় পায় না আজকাল।'

বললাম, 'ঘরকন্না নিয়ে খুবই বুঝি ব্যস্ত?'

সদানন্দ বলল, 'হু।'

শিয়ালদয়ের মোড়ে এসে সদানন্দ উঠে পড়ল, বলল 'আমি এখানে নামব।'

বললাল, চল আমিও নামি। আমারও একটু কাজ আছে ওদিকে, বৈঠকখানার বাজারটা একবার ঘুরে যাব।'

ট্রাম থেকে নেমে দুজনে এগুতে লাগলাম।

সদানন্দ বলল, 'আপনি কোথায় যাবেন?'

বললাম, 'সতীশকাকার দোকানটা হয়ে যাব। চল না, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে দেশের লোক দেখা সাক্ষাৎ হবে।

সদানন্দ বলল 'চলুন।'

পুরনো বাজারে সতীশ মল্লিকের ফার্নিচারের দোকান। তিনি আমাদের গাঁয়ের লোক। একটা পলিসি নেবেন বলে বহুদিন থেকে ভরসা দিচ্ছিলেন—ভাবলাম আর একবার তাগিদ দিয়ে যাই।

আমাকে দেখে সতীশকাকা আপ্যায়ন করে বসালেন, 'আরে এসো এসো, কি খবর তোমার?'

বললাম, 'খবর তো আপনার কাছে। যা বলেছিলাম মনে আছে তো?'

সতীশকাকা বললেন, 'আছে আছে। কিন্তু বিক্রিবাটা যে একেবারে নাই। সবুর কর, সময়মত সবই হবে। তোমাকে কিছু বলতে হবেনা।'

প্রতি মাসেই সতীশকাকা এ ধরণের কথা বলে আসছেন। আমি আর কোন জবাব দিলাম না, উঠে চলে আসছিলাম। সতীশকাকা বললেন, 'বোসো, বোসো।' তারপর সদানন্দের দিকে হঠাৎ ওর চোখ পরল—বললেন, 'আরে ওকে আবার কোত্থেকে জোটালে? ওর সঙ্গে দেখা হোলো কোথায়?'

আমি বললাম, 'কেন, আপনি জানেন না বুঝি? ও তো আমাদের অফিসেই কাজ করে।'

সতীশকাকা বাঁধানো দাঁতে হেসে বললেন, 'তাই নাকি? আমি সত্যি জানতাম না। তা অফিসে কি কাজ কর সদানন্দ?'

মুহূর্তের জন্যে ম্লান দেখাল সদানন্দের মুখ। মিথ্যে কথাটা চট করে যেন আমার সামনে বলতে পারছে না।

কিন্তু আমি বলতে পারলাম। সদানন্দের ওপর সহানুভূতিতে আমি হঠাৎ যেন মহানুভব হয়ে উঠেছি। একটু জোর করে টানাটানা হাসির সঙ্গে বলতে লাগলাম, 'কাজ আর কি সতীশকাকা অফিসের সেই একই কাজ। সেই দশটা-পাঁচটা কলম পেষা—'

হঠাৎ আমাকে বাধা দিয়ে সদানন্দ বলে উঠল, 'না সতীশকাকা, ওঁদের কাজ কলম পেষা হলেও, আমার কাজ আলাদা। আমি ওখানে বেয়ারা হয়ে ঢুকেছি।'

আমি আর সতীশকাকা দুজনেই স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। সদানন্দের কাছ থেকে এ ধরণের জবাব আমরা কেউ প্রত্যাশা করিনি।

সতীশকাকা একটু বাদে ফের হাসলেন, 'তা বেশ। আজকাল তো এই চাই। Dignity of labour. বেয়ারাগিরিই হোক আর কেরাণীগিরিই হোক সব নোকরি, কি বল হে কিরণ-কুমার?"

কিন্তু আমি বলব কি, রাগে অপমানে আমার কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাজারের ভিতর থেকে কোনরকমে বেরিয়ে এসে সদানন্দের মুখোমুখি দাঁড়ালাম। তারপর মনের সমস্ত জ্বালা জিভের ডগায় এনে তীব্র কণ্ঠে বললাম, 'এর মানে কি হোলো সদানন্দ?'

সদানন্দ কোন জবাব দিল না।

আমি তেমনি ঝাঁঝালো সুরে বললাম, 'এর মানে কি হোলো? নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের তোমার এত কি দরকার ছিল শুনি? সতীশকাকার কাছে আমাকে এমনভাবে মিথ্যেবাদী না বানালেই কি তোমার চলত না? আমি কি তোমার কোন উপকারই করিনি?'

সদানন্দ বলল, 'অনেক করেছেন কিরণদা, অনেক করেছেন। আপনাকে আমি মোটেই অসম্মান করিনি। আমি শুধু নিজের মান রাখতে চেষ্টা করেছি।' বললাম, 'কি করে মান তোমার রইল? নাকি রাতারাতি একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির বনে গেছ।'

সদানন্দ বলল, 'না না কিরণদা, ভুল বুঝবেন না। যুধিষ্ঠির ভীমের কথা নয়। আসল কথাটা আপনাকে বলা হয়নি।'

বললাম, 'তা'হলে দয়া করে বল।'

সদানন্দ একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'এখন আর বেয়ারাগিরির কথা গোপন করার আমার দরকার নেই কিরণদা। সুধা নিজেও আর তা চায়না।'

বললাম, 'কেন, তারই বা হঠাৎ এমন সুমতি হওয়ার কি কারণ ঘটল।'

সদানন্দ একটুকাল আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল তারপর বলল, 'সে নিজেও যে ঝি-গিরিতে ঢুকেছে কিরণদা। অনেক ধার দেনা হয়ে পড়েছিলাম।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'বল কি? ঝি গিরি?'

সদানন্দ বলল, 'হ্যাঁ, তবে কোন বাড়ির ঝি নয়, পাড়ার স্কুলের ঝি। বাসন মাজা, বাটনা বাঁটার কাজ করতে হয় না, কেবল এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে ছোট ছোট মেয়েদের স্কুলে নিয়ে যেতে হয়। তাদের দলে আমার মেয়েও থাকে। বিনে মাইনেয় স্কুলে পড়তে পায়। এও তো কম লাভ না।'

জিগ্যেস করলাম, 'কত মাইনে পায় সুধা?' যেন মাইনেটাই আসল কথা।

সদানন্দ বলল, 'পঁচিশ টাকা। প্রথমে ভেবেছিলাম বন্ধু-বান্ধবের কাছে ওকে মিস্ট্রেস্ বলেই চালিয়ে দেব। কিন্তু ওই নিষেধ করল। বলল, 'কি লাভ। এরই মধ্যে চেনাজানা কতজনের সামনে ধরা পড়ে গেছি।'

রাস্তার মোড়ে এসে বেলেঘাটার বাসে ওঠার আগে সদানন্দ তার কথা শেষ করল। 'পুরনো মাল কিনতে সতীশকাকা আমাদের ওদিকেও যাতায়াত করেন। একদিন সুধা হয়ত ধরা পড়ে যাবে। তার আগে নিজেই ধরা দিলাম কিরণ দা।'

মোড়ে বাসটা দাঁড়িয়ে আছে দেখে সদানন্দ তাড়াতাড়ি তাতে উঠে পড়ল। আমি বিমূঢ় হয়ে সেই যাত্রী বোঝাই চলন্ত বাসটার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

বেলগাছিয়ার মোড়ে মুদি আর মনোহারী দোকানের মাঝখানে ছোট সেলুনের নামটাই প্রথম আমার নজর টেনেছিল। দোকান ঘরের মাথার উপরে একখানা সাইনবোর্ড ঝুলানো। তাতে বড় বড় হরফে লেখা 'স্বাগতা সেলুন।' তারপরের লাইনে ছোট হরফে আছে, 'এখানে অল্পমুল্যে সযত্নে চুল ছাঁটাই ও দাড়ি কামান হয়।'

এর আগে সেলুনের অনেক রকম নাম দেখেছি। বেঙ্গল সেলুন, ভারত সেলুন, লক্ষ্মী সেলুন, গণেশ সেলুন। কিন্তু এই স্বাগতা সেলুন নামটি আমার কাছে ভারি নতুন লাগল। এই নাম-করণের মধ্যে খদ্দেরকে কৌশলে যেন স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে রাখা হয়েছে। আবার স-য়ে স-য়ে সইয়ে সইয়ে অনুপ্রাসও আছে একটু। মাথার বড় চুলগুলির মধ্যে একবার আঙ্গুল বুলিয়ে ঢুকে পড়ব কিনা ইতস্তত করছি, হঠাৎ কাটা দরজা ঠেলে বাইশ তেইশ বছরের কালো পানা একটি ছেলে মুখ বাড়াল। আমার দিকে চোখ পড়তেই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আস্থন। জায়গা খালি আছে। আস্থন না বাবু।'

আমি একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। বেলা সোয়া এগারটা যদিও এগারটা পর্যন্ত রবিবার অনেকের কাছেই সকাল। কিন্তু আমার একটু আরো সকাল সকাল বেরোবার তাড়া আছে। এদিকে চুলটা না ফেললেও নয়। মাস দেড়েকের ঔদাসীন্যে চুল প্রায় বাবড়ির মত হবার জো হয়েছে। কিন্তু হলে হবে কি, গত দু'তিন রবিবার ধরে চেষ্টা করছি পাড়ার কোন একটি সেলুন খালি পাইনে। সবগুলিই লোক বোঝাই। অপেক্ষমান খদ্দেরদের মুখ দেখে বোঝা যায়, তাদের প্রতীক্ষা পনের বিশ মিনিটের নয়, আরো বেশি। তাই ওয়েটিং লিস্টে

নাম না লিখিয়ে চুপ চাপ সরে পড়েছি। এমনি করে কয়েক রবিবার গেছে, আর এক রবিবারও যায়।

স্বাগতা সেলুনের মালিক আবারও ডাকল, 'আসুন, আসুন। জায়গা খালি আছে। বেশি সময় লাগবে না।'

একটু ইতস্তত করে ঢুকেই পড়লাম। ইদানীং চুলের দৈর্ঘ্য আর স্ত্রীর গঞ্জনার মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। বৃদ্ধির অনুপাত দ্বিতীয়টিরই যেন বেশি।

কিন্তু সেলুনের মধ্যে ঢুকে আমার চক্ষু স্থির। এখানেও ঘর ভরতি লোক। তাদের মধ্যে জন তিনেকের চুল ছাঁটাই, দাড়ি কামানো চলছে। আর বাকি খান-পাঁচ ছয় চেয়ার দখল করে যাঁরা বসে আছেন তাঁরা পূর্বগামীদের দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় জ্বলছেন।

আমি যে পায়ে ঢুকেছিলাম, ঠিক সেই পায়েই বেরিয়ে আসতে চাইলাম। মালিকের দিকে তাকিয়ে একটু ধমকের সুরে বললাম, 'এই বুঝি তোমার খালি জায়গা?'

ছেলেটি বিনীতভাবে বলল, 'জায়গা এক্ষুনি করে দিচ্ছি। আপনি বসুন।'

তারপর ওরই প্রায় সমবয়সী একটি ছেলে উত্তরদিকের যে চেয়ারখানায় চেপে বসেছিল তার কাছে গিয়ে ও বলল, 'ভাই অনিল, কিছু মনে কোরো না। তুমি একটু ঘুরে এস! ভদ্রলোককে বসতে দাও।' ছেলেটি বোধ হয় মালিকের বন্ধুশ্রেণীর কিংবা বাকিতে চুল দাড়ি কামিয়ে নেয়। প্রায় বিনা আপত্তিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'যাই দেখি চায়ের দোকানটা খোলা আছে কিনা। পেট চোঁ চোঁ করছে। তুমি তো দেখছি বেলা দুটোর আগে আমার মাথায় হাত দিতে পারবে না।'

অনিল চলে গেলে আমি তার উত্তরাধিকারী হয়ে চেয়ারে চেপে বসলাম। তারপর শঙ্কিতভাবে বললাম, 'সত্যিই বেলা দুটো বাজবে নাকি?'

মালিক হেসে বলল, 'না না, আপনার কাজ আমি অনেক আগেই সেরে দেব। আপনাকে আমি চিনি।'

গূঢ় রহস্যভরা হাসি হাসল ছেলেটি, 'আপনি তো কল্যাণ রায়। গল্প লেখেন।'

আমার গল্প লেখার খবর এই সেলুন পর্যন্ত এসে পৌঁচেছে দেখে আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম। তাহলে শুধু স্বজন বন্ধু নয়, জনগণেরও দু-একজনের নাগাল পাচ্ছি।

বললাম, 'তুমি আমাকে চিনলে কি করে।'

সে বলল, 'আপনার গল্পটল্প তো খুবই পড়েছি। সেদিন আমার এই সেলুনের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন বলল আপনি। ভাবলাম সেদিনই ডেকে আনি। কিন্তু ঘরে খদ্দের ছিল হাতে কাজ ছিল। সময় হয়ে উঠল না। আজ যখন দয়া করে এসেছেন, আপনাকে ছাড়ব না।'

খুশী হয়ে সাহিত্যানুরাগীর হাতে ধরা দিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

ও বলল, 'আশুতোষ শীল। এসেছেন যখন আলাপ পরিচয় সব হবে। একটু বসুন, আর দু-তিনটে মাথা আমি শেষ করে নিই। বেশি দেরি হবে না, আপনাকে তাড়াতাড়িই ধরব।'

দেখলাম আশু একা নয়, অল্প-বয়সী আরো দুটি ছেলে তার দোকানে কাজ করছে। কেউ দাড়ি কামাচ্ছে, কেউ খদ্দেরের মাথার পিছনে ক্লিপ চালাচ্ছে। খদ্দেররা বড় বড় আয়নার সামনে নিজেদের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে আত্মপ্রেমিক, স্বরূপমুগ্ধ 'নার্সিসাস' হয়ে বসে আছেন।

একজন উঠলেন, আর একজন বসলেন। তাঁর মাথায় কাঁচি ধরবার আগে আশু আর একবার এসে আমার খোঁজ নিয়ে গেল। স্মিত সৌজন্যে বলল, 'আপনার খুব কষ্ট হচ্ছে?'

আমি বললাম, 'না না না। তুমি কাজ কর।'

আশু বলল, 'আজকের কাগজ পড়েছেন? পড়ে দেখুন। খবর ছাড়াও ভালো ভালো গল্প প্রবন্ধ সব আছে। আজ রবিবার কিনা।'

বললাম, 'পড়েছি।'

আশু দমল না। একটি জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আর দুখানা মাসিক পত্রিকা এনে আমার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এগুলি দেখেছেন? সব এ মাসের। একেবারে নতুন

আমি বললাম, 'পরে দেখব, এখন রেখে দাও।'

ময়রাও মাঝে মাঝে সন্দেশ খায়, তবে সেলুনে বসে খায় না।

আশু বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই চলে গেল। ভাবলাম ওর হাত থেকে একটা কাগজ নিলেই হত। চায়ের দোকানে খবরের কাগজ রাখতে দেখেছি, ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে কি উকিলের বৈঠকখানায় অধীর আগন্তুকদের চিত্ত বিনোদনের জন্যে ছ'মাস আগের পুরোন ইংরেজী সাপ্তাহিক চোখে পড়েছে। কিন্তু সেলুনের মালিকের এই সাহিত্যপ্রীতি আমি এর আগে আর দেখিনি।

খানিক বাদে আশু এসে বলল, 'বসুন এসে।'

লম্বা ঘরের মধ্যে দুটি সারি। আয়নার সামনে খদ্দেররা উপবিষ্ট। আশুর সহকারীরা কাঁচি চালাচ্ছে, ক্ষুর চালাচ্ছে। কোণের দিকের একটা চেয়ার খালি হতেই আশু সেখানে ডেকে নিয়ে আমাকে বসাল। পূর্বগামীদের চোখে-মুখে যে প্রতিবাদ ফুটে উঠল তাতে আমার বুঝতে বাকি রইল না, আশু আমার ওপর একটু বেশি পক্ষপাত দেখিয়েছে। ভদ্রতা ক'রে বললাম, 'আমি বরং বসছি তুমি ওঁদেরটা আগে শেষ করে দাও।'

কিন্তু আশু তাঁদের দিকে ফিরে হাত জোড় ক'রে বলল, 'আপনারা একটু দয়া করে বসুন। উনি অন্যপাড়া থেকে এলেন, এই প্রথম এলেন আমার দোকানে। ওঁর কাজটা আগে সেরে দিই। আমার বেশি সময় লাগবে না।'

দুজন বসে অপেক্ষা করলেন। একজন রাগ ক'রে উঠে যেতে যেতে বললেন, 'পারি তো ওবেলায় আসব।'

অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার সময় যেমন পরায় আশু আমাকে তেমনি একটা সাদা আলখাল্লা পরিয়ে দিল, তারপর আমার ঘাড়টা একটু ঘুরিয়ে দিতে দিতে ঘনিষ্ঠ একটি পাঠক বন্ধুর মত জিজ্ঞাসা করল আজকাল কি লিখছেন টিকছেন।'

আমি ওর কথার জবাব দিয়ে দু'চারটে পাল্টা প্রশ্ন করলাম। দেখলাম আত্মপরিচয় দিতে আশু মোটেই কুণ্ঠিত নয়। জিজ্ঞাসা না করতেও, ও অনেক কথাই বলল। বাড়ি ছিল বরিশালে। বাসস্থান পাকিস্তান হওয়ার পরে সব শুদ্ধু চলে এসেছে। অবশ্য নিজে এসেছিল অনেক আগেই, ছেলেবেলায়। বাপ মারা যাওয়ার পর বেলেঘাটায় মামাদের বাসায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল। ইচ্ছে ছিল পড়াশুনো করবে। কিন্তু বড় মামা হাই স্কুলের মাত্র দু'তিন ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়ে নিজেদের সেলুনে এনে ভর্তি করে দিলেন। বললেন, 'বি-এ, এম-এ পাশ করে করবি কি। কত সব পাশকরা ছেলে শহরের অলিতে গলিতে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার চেয়ে হাতের কাজ শেখ পেটের ভাত ক'রে খেতে পারবি।'

আশুর তখন প্রতিবাদ করবার সাধ্য ছিল না। কিন্তু বড় হয়ে বুঝেছিল পড়াশুনোটা শুধু পেটের খোরাকের জন্যে নয়, মনের খোরাকের জন্যেও। স্কুল ছাড়লেও আশু পড়া ছাড়ল না। তবে পাঠ্য বই নয়। গুরুজনদের কাছে যা অপাঠ্য বলে নিন্দনীয়, বর্জনীয়, সেই সব নভেল আর নাটক। ছেলেবেলা থেকেই আশু ওই সব 'বাজে' বইয়ের পোকা। হাতের কাছে যা পেত তাই পড়ত। অবশ্য হাতের কাছে বলতে গেলে কিছুই পেত না। মামাবাড়িতে একখানা বইও ছিল না। পাড়া পড়শীর কাছ থেকে চেয়ে চিন্তেই আনত। কিন্তু তাই নিয়েও মামার শাসন, মামীর তিরস্কার। আরো নানারকমের অশান্তি দুই মামার মধ্যে এক মামা রাখতে চায়, আর এক মামা চায় না। এই নিয়ে দুই ভাইয়ে ঝগড়াঝাটি রোখারোখি। শেষ পর্যন্ত ষোল সতের বছর বয়সে আশুই একদিন মামাবাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। কলকাতার নানা সেলুনে কাজ করল, বউবাজারে, মীর্জাপুরে।

তারপর বছর তিনেক হল, আশু নিজে এই সেলুনের মালিক হয়েছে। টাকা দিয়ে কিনতে পারেনি। বুড়ো প্রাণকুমার প্রামাণিক ছিল এই সেলুনের মালিক। তার আর কেউ ছিল না। মরবার সময় আশুরই হাতের জল পেয়েছে। মরবার পরে আশুর হাতেরই আগুন পেয়েছে। সেই দিয়ে গেছে এই সেলুন। তখন অবশ্য সেলুনের হাল অনেক খারাপ ছিল। সাইনবোর্ড ছিল না, ফার্নিচার ছিল না। কিন্তু আশু নিজের হাতে নিয়ে সেলুনের ভোল ফিরিয়ে দিয়েছে। অবশ্য খরচপত্র অনেক হয়েছে। দেনাদার কম হয়নি।

'কিন্তু আপনাদের দশজনের আশীর্বাদে সব সামলে নিয়েছি।'

আত্মতৃপ্ত আশুতোষ আমার গালে শুগন্ধি সাবান মাখাতে মাখাতে হাসল। ওর হাসিতেও যেন সাদা ফেনার আভাস।

বললাম, 'বাসায় কে কে আছে?'

আশু বলল, 'বিধবা মা আর ছোট বোন।'

বোন অবশ্য খুব ছোট আর নেই। বড় সড় হয়েছে। বছর ষোল হল বয়স। হাই স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ে। বেশ সুন্দরীই হয়েছে সুবর্ণ। দেখলে সবাই বামুন কায়েতের বড়ঘরের মেয়ে বলে ভাবে। শুধু যে পড়াশুনোয় ভালো তাই নয়, এম্‌ব্রয়ডারির কাজ জানে, রবীন্দ্রসঙ্গীত তু'চারখানা গাইতে জানে। কিন্তু জানলে হবে কি, এই বোনকে নিয়েই, মায়ের সঙ্গে আশুর নিত্য ঝগড়া। মা বলে, 'ওকে, এক্ষুনি বিয়ে দিয়ে দে। আর কত বড় করবি। ও বয়সে আমার বিয়ে তো ভালো, তুটি ছেলেপুলে হয়ে গেছে। একটি কাঁচা গেছে, আর একটি তুই।'

আশু জবাব দেয়, 'তা হোক তোমাদের কাল আর নেই। ওকে আমি বি-এ, এম-এ পাশ করাব, তারপর বিয়ে দেব। আমার তো কোন সাধ মেটেনি। ওকে দিয়ে সব সাধ মেটাব।'

মা বলে, 'পোড়া ছাই। ও কি তোর মত বেটাছেলে? ও যে মেয়ে, মেয়ে মানুষ।'

আশু জবাব দেয়, তা হোক। আজ-কাল মেয়েছেলে স্কুল কলেজে পড়লে জাত যায় না, জাতে বড় হয়।

সুবর্ণের যে বিয়ে বসতে মাঝে মাঝে সাধ না হয় তা নয়। কিন্তু বেশিক্ষণ সে সাধ স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে না। এখানকার হালচাল তো সেও জানে, দেখে তো আরো দশজন স্কুল-কলেজের আর অফিসের মেয়েদের। সুবর্ণ দাদার খুব ভক্ত, বাধ্য। আশুর বই পত্রপত্রিকা সব সে যত্ন ক'রে গুছিয়ে রাখে। এক টুকরো কাগজও এদিক-ওদিক হ'তে দেয় না। একখানা মাত্র ঘরে তিনজনে থাকে। সে ঘরে এত সব পুরোন বই আর কাগজপত্রের রাশ দেখে আশুর মা ভারি রাগ করে। এক একদিন চটে গিয়ে বলে, 'সব আমি উনুনে দেব। কিন্তু দেয় না। বইপত্রের মর্ম না বুঝলে কি হবে, ছেলেমেয়েদের মন আশুর মাও বোঝে।

দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। পকেট থেকে একখানা আধুলি বার ক'রে ওর হাতে দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা সেলুনের স্বাগতা নামটা কার দেওয়া? তোমারই তো?'

আশু একটু লজ্জিত ভঙ্গীতে হাসল, 'আমারই। সে কথা আপনাকে পরে আর একদিন বলব। আপনি কিন্তু আমার সেলুনেই আসবেন। জানেন সবাই বলে এটা সাহিত্যিকদের সেলুন। এ পাড়ায় তো অনেক লেখক আছেন। নিয়মিত না এলেও মাঝে মাঝে তাঁরা আসেন। আপনিই সবচেয়ে পরে এলেন।'

মাসখানেক পরে ফের দেখা। সেবার গিয়ে শুনলাম স্বাগতা নামের ইতিবৃত্ত। আশুর মায়ের ইচ্ছে ছিল ঠাকুর দেবতার নামে নাম রাখা হয় দোকানের। কিন্তু এই নতুন নামটি আশু নিজে জেদ করে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করে রেখেছে। এখন দেখা যাচ্ছে এ নামেরও পয় আছে, মানে আছে। অনেকেই এই নামটির জন্যে আশুর তারিফ করে আজকাল।

আমি হেসে বললাম, 'নামটি কার? তোমার চেনাশোনা কারো নাকি?'

আশু লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে গেল। জিভ কাটল খানিকটা। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আপনাকে আর একদিন বলব।'

আমি পীড়াপীড়ি করলাম, 'আর একদিন কেন। আজই বল না। লজ্জা কি। আমি ছাড়া আর কেউ শুনবে না। যা ক্ষুরকাঁচির শব্দ হচ্ছে চারদিকে।'

আশু তখন পিছনে দাঁড়িয়ে আমার ঘাড়ের কাছে ক্লিপ চালাতে চালাতে খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিস ফিস করে ব্যাপারটা খুলে বলল। না চেনা মেয়ে নয়, চেনা মেয়ে আসবে কোত্থেকে। আসল মেয়ে যার নাম স্বাগতার মত আধুনিক আর মধুর তেমন নামের মেয়ের সঙ্গে আশুর পরিচয় কোত্থেকে হবে। স্বাগতা গল্পের মেয়ে। আশু অনেকদিন আগে পড়েছিল গল্পটি। প্রায় বছর চারেক আগে। লেখকের নাম বিশ্বম্ভর বসু। সে নামের লেখককে আর তারপর খুঁজে পায়নি। বোধহয় ছদ্মনাম হবে। কিন্তু গল্পটি আশুর মনে গাঁথা হয়ে আছে। স্বাগতা অপরূপ সুন্দরী বামুনের ঘরের বিদুষী মেয়ে। কিন্তু সে তার চেয়ে অনেক কম লেখাপড়া জানা দরিদ্র নাপিতের ঘরের ছেলেকে ভালোবেসে ছিল। ছেলেটির আর কোন গুণ ছিল না, শুধু গান জানত, চমৎকার গাইতে পারত। সেই গানের টান এতই বেশি যে স্বাগতা ঘর ছাড়ল, বাপমাকে ছাড়ল, সবার নিষেধ অমান্য করে বেরিয়ে এসে বিয়ে করল সেই গরিব ছেলেটিকে। স্বাগতা নামটি সেই গল্প থেকে পেয়েছে আশু।

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'তুমিও কি গান জানো নাকি?'

আশু লজ্জিত হয়ে বলল, 'না, না, কি যে বলেন। আমি ক্ষুর কাঁচি ধরা ছাড়া আর কিছু জানিনে।'

পয়সা মিটিয়ে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসছি, আশু হঠাৎ বলল, 'কল্যাণবাবু, আপনার সঙ্গে আমার আর একটা কথা আছে।'

'বল।'

আশু একটু ইতস্তত করে বলল, 'আপনাদের সকলের সঙ্গেই

পরিচয় হল, সকলের কাজই করলাম, কিন্তু শশাঙ্ক শেখরবাবুকে খুব কাছে থেকে কোনদিন দেখলাম না। বড় ইচ্ছে একদিন তাঁর কাজ করি।'

শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী একালের একজন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনিও কাছাকাছিই থাকেন।

হেসে বললাম, 'আচ্ছা, শশাঙ্কবাবুকে বলব তোমার কথা।'

আশু খুশি হয়ে বলল, 'দয়া ক'রে বলবেন। তাঁর কত গল্প পড়েছি, উপন্যাস পড়েছি, সিনেমায় থিয়েটারে তাঁর বইয়ের কত অভিনয় দেখেছি। আহাহা কি চমৎকারই না লেখেন। একদিন তাঁকে নিয়ে আসুন। তিনি যদি দয়া ক'রে আমার এই সেলুনে পায়ের ধুলো দেন, আমি ধন্য হয়ে যাব।'

সেদিন সকালে শশাঙ্কশেখরের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। তিনি লিখছিলেন। লেখা বন্ধ ক'রে বললেন, 'এসো এসো। কি ব্যাপার!'

বললাম, 'শশাঙ্কদা আপনাকে আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে হবে।'

শশাঙ্কদা হেসে বললেন, 'Thou too Brutus! কল্যাণ, তুমিও সভাসমিতির পাণ্ডাগিরি শুরু করেছ। না ভাই, আর না। বড় হয়রান হয়ে পড়েছি। শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না।'

বললাম, 'সভাসমিতি নয়, সেলুন।'

সব শোনবার পর তিনিও হাসলেন, বললেন, 'বেশ। গল্প লেখা ছেড়ে শেষ পর্যন্ত বুঝি সেলুন, লণ্ড্রির দালালী শুরু করলে?'

বললাম, 'কি আর করি, গল্পের চেয়ে দালালীতে পয়সা বেশি।'

শশাঙ্কদা বললেন, 'তাতো বুঝলাম, কিন্তু পয়সার জন্যেই কি সব কর?'

তিনি অবশ্য সেলুনে যেতে তখন তখনই রাজী হলেন না। তাঁর বাঁধা পরামাণিক আছে। সে রোজ এসে ওঁকে ক্ষৌরী ক'রে দিয়ে যায়।

অনেক অনুরোধ উপরোধের প'রে মাসখানেক বাদে স্বাগতা সেলুন আর তার সাহিত্যানুরাগী মালিকটি সম্বন্ধে শশাঙ্কশেখরের কৌতূহল উদ্রিক্ত করতে পারলাম। একদিন বেলা দশটা সাড়ে দশটার সময় তাঁকে নিয়ে হাজির হলাম স্বগতা সেলুনে। তাঁকে দেখে আশুর তো আশাতীত আনন্দ। কোথায় বসতে দেবে ভেবে পায় না। সেদিন অবশ্য সেলুনে বেশি ভিড় ছিল না। বারটা রবিবার নয়।

শশাঙ্কশেখর নিজেই একটা চেয়ার টেনে বড় আয়নার সামনে বসে পড়লেন। তারপর আয়নার মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে খানিকটা কি ভাবলেন কে জানে। নিজের ছায়া দেখে নিজেকে কতটুকু চেনা যায়। ছায়াতে কায়ার সাদৃশ্য ছাড়া কতটুকুই বা ধরা পড়ে।

একটু বাদে তিনি আশুকে ডেকে বললেন, 'এসো হে। চুলটা একটু ছোট করেই দাও। ততক্ষণ তোমার সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে গল্প করি।'

আশু পরম অনুগৃহীত হয়ে বাছা বাছা সাজ-সরঞ্জাম সব নিয়ে এল। শশাঙ্কশেখর তার সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তুললেন। তিনি যেমন বড় লেখক, কথকও তেমনি।

আমি দূরে একটা চেয়ারে বসে মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাতে লাগলাম। আর মাঝে মাঝে লক্ষ্য করলাম। শশাঙ্কশেখর বেশি কথা বলতে পারছেন না। তাঁকে নীরব শ্রোতা বানিয়ে আশুই সব কথা বলে যাচ্ছে। শশাঙ্কশেখরের লিখিত গল্প-উপন্যাসের বিশদ সমালোচনা করছে আশু। প্রায়ই শুনতে লাগলাম, 'আহাহা, আহাহা'। মাথা ছেড়ে আশু মুখ ধরল। সাবান মাখাতে লাগল গালে। তারপর ওর সবচেয়ে ভালো ক্ষুরখানা বেছে নিয়ে একবার ধার পরীক্ষা করে শশাঙ্কশেখরের গালে ছোয়াল। 'অমুক গল্পটি যা লিখেছেন, আহাহা। অমুক চরিত্রটি যা হয়েছে আহাহা।' আশুর মুখ থেকে প্রায়ই শুনতে লাগলাম।

'উঁহুহু, উঁহুহু।'

আশুর নয়, শশাঙ্কশেখরের গলা।

আমি চমকে উঠে চোখ ফেরালাম, তারপর এগিয়ে গেলাম কাছে। বললাম, 'কি হয়েছে?'

সাবানের সাদা ফেনার ভিতর দিয়ে রক্তের আভাস বেরোচ্ছে। দাড়ি কামাতে গিয়ে অন্যমনস্ক আশু তার ধারালো ক্ষুর খানিকটা বসিয়ে দিয়েছে শশাঙ্কশেখরের গালে।

রক্ষা যে বেশি কাটেনি। খানিকটা ফিটকিরি ঘষবার পরেই অবশ্য রক্তটা বন্ধ হল।

কিন্তু শশাঙ্কশেখর চটে উঠে ধমক দিয়ে বললেন, 'তুমি কি হে ছোকরা। তুমি এই রকম কাজ শিখেছ নাকি? এই বিদ্যে নিয়ে সেলুন চালাও? গালে না বসিয়ে তুমি তো গলায়ও ক্ষুর বসাতে পারতে হে।'

পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে চেঞ্জ না নিয়েই শশাঙ্কশেখর সেলুন থেকে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগলেন বাড়ির দিকে।

আমি পিছনে পিছনে যাচ্ছিলাম, তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'থাক থাক, তোমার আর আসতে হবে না।' বুঝতে পারলাম খুব রাগ করেছেন। বোধ হয় খুব লেগেওছে।

আমি চলে এলাম স্বাগতা সেলুনে। পরম অপ্রস্তুত হয়ে আশু দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর যেন নড়বার চরবার শক্তি নেই, কথা বলবার শক্তি নেই।

একটু বাদে আশু বলল, 'কি করলাম কল্যাণবাবু।'

আমি বললাম, 'ভারি অন্যায় করেছ।'

আশু বলল, 'আমি ও'র একটি গল্পের কথাই ভাবছিলাম। মাঝখান থেকে কাণ্ডটা হয়ে গেল। কোনদিন আমার এমন হয়নি, জীবনে কোনদিন হয়নি। ক্ষুরতো আজ নতুন ধরিনি কল্যাণবাবু, সেই ছোটবেলা থেকে ধরেছি।'

আমি কি বলব ভেবে পেলামনা।

আশু বলতে লাগল, 'আজ আমি বাড়ি গিয়ে সব বই পত্তর পুড়িয়ে ফেলব। কোনদিন নভেল নাটক ছোঁব না। মামা-মামী মারধোর করে আমাকে দিয়ে যা করাতে পারেন নি, আজ আমি নিজের ইচ্ছায় তাই করব।'

আমি বললাম, 'আহা হা, অত উতলা হচ্ছ কেন?'

কিন্তু আমার কথা যেন আশুর কানে গেলনা। সে তেমনি বলে যেতে লাগল, 'আপনি ওঁকে আর একদিন শুধু এনে দিন। সেদিন আমি কোন নভেল নাটকের কথা তুলবনা, কোন নায়ক নায়িকার কথা বলবনা। মুখ বুজে শুধু কাজ করব। উনি শুধু জেনে যান যে, আমি কাজ জানি। ভালো করে, যত্ন করে কাজ করি। কিন্তু উনি বোধ হয় আর কোনদিন এখানে আসবেন না। আপনার কি মনে হয় কল্যাণবাবু, আসবেন?'

আশু ছল ছল ছুটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল।

॥ গহণা ॥

'এই যে আসুন কল্যাণবাবু, আসুন মালক্ষ্মী, আসুন।'

মণিকাকে নিয়ে দোকানের সামনে এসে দাঁড়াতেই নির্মলা জুয়েলারী ওয়াক্ ‌স্ এর মালিক রমণীবাবু সহাস্যে সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানালেন।

পাশাপাশি দুই'খানা গদি আঁটা চেয়ার। আর একখানা শুধু কাঠের। রমণীবাবু আমাদের জন্য ভালো দু'খানা চেয়ার ছেড়ে দিয়ে নিজে গিয়ে বসলেন হাতলহীন সেই শক্ত চেয়ারটায়। তারপর আর একটু হেসে বললেন, 'একেবারে ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা।'

দেয়ালের বড় ঘড়িটার দিকে একটু তাকালেন রমণীবাবু। আমি আর মণিকাও সেই দিকে চাইলুম। ঠিক কাঁটায় কাঁটায় নয়, পাঁচটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়েছে।

বললুম, 'জিনিষটা হয়ে গেছে আমাদের?'

এবার দোকানের ভিতরের দিকে তাকালেন রমণীবাবু। সামনে দুটি বড় বড় কাঁচের শো কেস্। তার ভিতরে কয়েক রকমের হার, কানবালা আর্মলেট থেকে সুরু করে আরো সব বিচিত্র রমণীয় অঙ্গাভরণ। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র। পুবদিকের দেয়ালে উঁচু ক'রে টানানো কুলুঙ্গিতে ছোট্ট একটি গণেশমূর্তি, ফুলে, বেলপাতায়, সিন্দুরে, চন্দনে প্রায় আচ্ছন্ন। পাশে কালীঘাটের কালীর বাঁধানো ফটো। ফুল চন্দনে তার প্রায় অর্ধেকটা ঢেকে যাওয়ার জো হয়েছে। অন্যান্য দেওয়ালগুলিতে গান্ধীজী, জওহরলাল, সুভাষচন্দ্রের প্রতিকৃতি। এসব অতিক্রম ক'রে দোকানের আরও ভিতরের দিকে তাকালেন রমণীবাবু। সেদিকটা ঠিক তেমন পরিচ্ছন্ন নয়, ছোট ছোট হাপরের সামনে জন তিনেক লোক মাথা নিচু ক'রে কাজ ক'রে চলেছে।

তাদের ভিতর থেকে একজনকে লক্ষ্য করে রমণীবাবু বললেন, 'কি

াদ, আর দেরী কত তোমার? শেষ কর, শেষ কর। ওঁরা এসে বসে রইলেন। আর কতক্ষণ লাগবে?'

ক্ষীরোদ একবার মাথা তুলে আমাদের দিকে তাকাল, 'এই হয়ে এল বাবু।'

রমণীবাবু সহাস্যে প্রতিধ্বনি করলেন, 'হয়ে এল কল্যাণবাবু। বোধ হয় আর দশ পনের মিনিটের বেশি দেরি হবে না।'

অপ্রসন্ন সুরে বললুম, 'এখনো দশ পনের মিনিট! কিন্তু আপনার ঠিক সাড়ে চারটেয় হার ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল রমণীবাবু।'

'তা ছিল। সে কথা আপনি বলতে পারেন কল্যাণ বাবু।'

রমণীবাবু তেমনি স্নিগ্ধ ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কিন্তু হাতের কাজ, সময়টা ঠিক একেবারে আন্দাজ করে ওঠা যায় না। ওপ্রফুল্ল, ছু'কাপ চা আনো দেখি। মালক্ষ্মী যখন দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিয়েছেন—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, চা আবার কেন।'

মণিকাও আপত্তি করল, 'না না না, আমি কিন্তু চা—'

রমণীবাবু তেমনি বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, 'লজ্জা করবেন না মালক্ষ্মী। যাও হে প্রফুল্ল, তাড়াতাড়ি ছু'কাপ চা নিয়ে এসো মোড়ের সেঙ্গুভেলী থেকে। বেশ চমৎকার চা করে ওরা। বলো যেন, দেখে শুনে বেশ ভালো ক'রে তৈরী ক'রে দেয়।'

কারিগরদের ভেতর একজন উঠে চা আনতে চলে গেল। তবু উসখুস করতে লাগলুম ছুজনেই। সান্ধ্য শোয়ের সিনেমার টিকিট রয়েছে পকেটে!

আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে যা হোক। মাস ছুয়েক আগে এ ফ্যাসাদের গোড়াপত্তন করেছে স্বয়ং মণিকা—আমার সহধর্মিণী। পুষ্পহারের নতুন ডিজাইনের ছবি বেরিয়েছিল আনন্দবাজার পূজা সংখ্যার বিজ্ঞাপনে। মণিকাকে অপলকে সেদিন সেই ডিজাইনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলাম। একটু বাদে মণিকা বলেছিল 'প্যাটার্ণটি বেশ, না? একেবারে নতুন ধরণের।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারিনি এই সমর্থনে কতখানি অনর্থ ঘটবে।

তারপর দু'দিন যেতে না যেতেই মাণিকা প্রস্তাব ক'রে ফেলল, 'দেখ' একটা কথা। আমার হারটা সেই যে কতদিন হোল ভেঙে পড়ে রয়েছে তার আর কিছুই করা গেল না। ভেবেছি কি ওই নতুন ডিজাইনের ধরণে জিনিষটাকে আবার করিয়ে নিলে হয়। ডিজাইনটা বীণা রেবাদেরও দেখিয়েছি। তাদেরও খুব পছন্দ। সবাই বলছে এইটাই সবচেয়ে মডার্ণ ডিজাইন।'

বললুম, 'হুঁ।'

অবশ্য কেবল 'হুঁ' বলেই নিরস্ত রইলুম না। সস্ত্রীক দু' তিনবার সিনেমায়ও গেলাম ইতিমধ্যে; কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। সেই হারের প্যাটার্ণের জ্বলন্ত চিত্র তিন তিনটে ছবিতে কিছুতেই ঢাকা পড়ল না।

মণিকা বলল, 'অত ইতস্তত করছ কিজন্য। আমি তো আর নতুন গয়না গড়িয়ে দিতে বলছি না। আমার জিনিষ ভেঙেই আমার জিনিষ গড়ব। কেবল বানীর টাকাটা ঘর থেকে লাগবে। তাতেই তোমার এমন আকাশ পাতাল চিন্তা লেগে গেছে—'

গৃহের শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় অতঃপর হার মানলুম। চিন্তা ছেড়ে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। অফিসে বেরুবার সময় প্যাটার্ণওয়ালা বিজ্ঞাপনের পাতাটা আর মণিকার হারগাছা পকেটে ক'রে নিয়ে গেলাম সেদিন।

হুজুরীমল লেনের এই নির্মলা জুয়েলারী ওয়ার্কস্ এর সঙ্গে আগেই একটু পরিচয় ছিল। বোনের বিয়ের সময় তার তিন চারখানা গহনা করিয়েছিলাম এখান থেকে। ছুটির পরে এসে হার আর বিজ্ঞাপনের পাতটা দিলাম বের ক'রে।

দোকানের মালিক রমণীবাবু দেখেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এ জিনিষ আমার কারিগরেরা অনেক ক'রেছে। আজকাল এইটাইতো ফ্যাসান। কিছু ভাবনা নেই আপনার। অবিকল এই নক্সার মত হবে। নক্সা নিয়ে যান আপনি। এ প্যাটার্ণ কাছে আছে।'

কিন্তু কেবল বানী নয়, আরো আনি দশেক সোনা লাগবে। হারটা

ওজন ক'রে হিসাব দিলেন আমাকে রমণীবাবু। কি আর কার। যা লাগবার লাগবেই। ক্ষেত্রে নেমে আর পিছিয়ে লাভ কি। সামান্য যা পুঁজি ছিল এবার তা নিঃশেষ হবে।

কিন্তু হাঙ্গামা কেবল এতেই চুকল না। সাতদিন পরে ছিল ডেলিভারির তারিখ। আমি অফিসের ফোন নম্বর দিয়ে এসেছিলাম। যদি কোন কারণে একদিন দেরী হয় খবর দেবেন, যেন এসে ফিরে যেতে না হয়। দিন কয়েক পরে দেখি রমণীবাবুর এক পোষ্ট কার্ড এসে উপস্থিত। 'কাজের চাপে তারিখটা একটু পিছাইয়া দিতে হইল। বুধবার নয়, রবিবার। বিকাল চারটার মধ্যে জিনিষ আপনাদের অবশ্যই তৈরী থাকবে, মালক্ষ্মী যেন অপরাধ না নেন।'

মালক্ষ্মীর উল্লেখ থাকায় মণিকার মনটা একটু ভিজল, বলল, 'আচ্ছা রবিবারই যাওয়া যাবে। একসঙ্গে বেরুব। সন্ধ্যার শোয়ে একেবারে 'কুলাঙ্গনা' দেখে ফিরব। শুনেছি বইটা নাকি ভালো হয়েছে। আর ওই সঙ্গে মানসীদেরও একটু খোঁজ নিয়ে আসা যাবে। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।'

মানসী মণিকার মাসতুতো বোন। আজ হঠাৎ তাকে কেন মণিকার মনে পড়ল সে কথা মনে মনেই থাকুক। প্রকাশ্যে বলা বাহুল্য।

সেজে গুজে চারটের মধ্যেই তৈরী হয়ে নিয়েছিল মণিকা। কিন্তু দোকানে এসে দেখলুম হার এখনো তৈরী হয়নি। মনটা খিঁচড়ে গেল। মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনটাও অনুমান করতে অসুবিধা হোলনা।

কিন্তু রমণীবাবুর দিকে তাকিয়ে দেখলুম তার মুখের বিকার নেই। পঞ্চান্ন বছরের প্রৌঢ় হলেও বেশ গোলগাল ভরাট মুখ। স্মিত সৌজন্যের হাসিটুকু লেগেই আছে ঠোঁটে।

চা আসতেই কারিগরের হাত থেকে নিজেই সাগ্রহে চায়ের কাপ নিয়ে আমার আর মণিকার হাতে একটি একটি ক'রে তুলে দিলেন রমণীবাবু।

চায়ের কাপটা পেয়ে একটু ভালই লাগল। তবু সৌজন্য দেখিয়ে বললুম, 'আঃ এসব আবার করতে গেলেন কেন।'

মণিকার সামনে চায়ের কাপটা রমণীবাবু ধরতেই মণিকা আরক্ত মুখে বলল, 'না না না, আমার লাগবে না' বরং আপনি নিন।'

রমণীবাবু স্নিগ্ধভাবে হেসে আমার দিকে তাকালেন, 'ওই দেখুন, আগেই সন্তানের কথা মনে পড়েছে। মা না হলে এমন হয়।' তারপর আবার ফিরলেন মণিকার দিকে, 'নিন, মালক্ষ্মী, কোন সঙ্কোচ করবেন না। আমি এই মাত্র চা খেয়েছি।'

খিঁচড়ানো মনটা আবার প্রসন্ন হতে সুরু করল।

চা শেষ হয়ে গেলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করলেন রমণীবাবু, এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আসুন।'

মণিকাকে বললেন, 'মালক্ষ্মী আপনার জন্য পান আনাই একটা?'

মণিকা বলল, 'না না না, পান খাইনে আমি।'

ঢং ক'রে সাড়ে পাঁচটা বাজল। আমি একবার হাত ঘড়ির দিকে তাকালাম, আর একবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে। পাঁচ মিনিট স্লোই আছে বরং রমণীবাবুর ঘড়ি। তারপর দৃষ্টিক্ষেপ করলাম ভিতরের কারিগরদের দিকে। তাদের হাতের কাজের বিরাম নেই। বুঝতে পারলুম আমাদের হারটা এখনো শেষ হয়নি। আমাদের দেখাদেখি রমণীবাবুও তাকালেন তার কারিগরদের দিকে, মনে হোল একটু যেন গম্ভীর হোল তাঁর মুখ। কিন্তু আমাদের দিকে স্মিত হাস্যেই তাকালেন, বললেন, 'এবার হয়ে গেছে। এই পালিশটা কেবল বাকি।'

মিনিট কয়েক আগে চা সিগারেট যিনি খাইয়েছেন তাঁকে আর আগের মত তাগিদ দেওয়া যায় না। মৃদুস্বরে বললুম, 'একটু তাড়া ছিল কিনা।'

মণিকা উঠে শো কেসটার ধারে গিয়ে দাঁড়াতেই রমণীবাবু সোৎসাহে বলে উঠলেন, 'দেখুন মালক্ষ্মী, ঘুরে ঘুরে সব দেখুন। কানপাশার চমৎকার একটা ডিজাইন বেরিয়েছে, ওই ডান দিকের শো কেসটায় আছে। খুলে দেখাব?'

রমণীবাবু এগিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক রমণীবাবু, আর ডিজাইন দেখিয়ে দরকার নেই। এক হারের ডিজাইনেই যে দুর্ভোগ ভুগছি। যে বাজার, তাতে কি গয়নার সখ আমাদের মত মানুষের সাজে?'

বুঝতে পারলুম খোঁচাটা মণিকাকে একটু বেশী রকমই লেগেছে। শো কেসের দিকে আর না এগিয়ে মুখ ভার ক'রে মণিকা এসে ফের আমার পাশের চেয়ারটায় বসল। মাথার আঁচলটা শিথিল হয়ে খুলে পড়েছিল কাঁধের ওপর। সেটাকে টেনে নিয়ে মণিকা ফের যথাস্থানে ঠিক ক'রে দিল।

রমণীবাবুও বসলেন এসে চেয়ারে। আমাদের দুজনের মুখেই একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটু হাসলেন, 'কথাটা কিন্তু ঠিক হোলনা আপনার কল্যাণবাবু। মেয়েদের গয়নাকে আপনি যত বাজে বিলাসিতার জিনিষ বলে মনে করছেন আসলে কিন্তু গয়না তা নয়। এককালে আমারও ওই রকমই ধারণা ছিল। এখন আর তা নেই। মেয়েদের গয়না যে কি বস্তু তা জীবনে ঠেকে শিখেছি কল্যাণবাবু।'

তাঁর বলবার ভঙ্গি দেখে আমরা দুজনেই তাঁর মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে তাকালাম। পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হবে রমণীবাবুর বয়স। মাথার তেলোটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঠোঁটের ওপর পুরু বড় বড় একজোড়া গোঁফে তা পুষিয়ে নিয়েছেন রমণীবাবু। সোনার আংটায় আটকানো হাতে একটা বড় কবচ। গায়ে আটপোরে হাত কাটা সাদা ফতুয়া। নিচের বোতামগুলি লাগাবার চেষ্টা করা হয়নি। কিংবা লাগালেও খুলে গিয়ে সুগোল সুবৃহৎ ভুঁড়িকে আত্মপ্রকাশের অবাধ সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু কথাগুলি যেন এই রমণীবাবুর মুখ থেকে বেরোয়নি। যেন আরেকজনের মুখ থেকে কথা শুনছি আমরা।

ভূমিকার পর মূল কাহিনী সুরু করলেন রমণীবাবু। আমরা উৎকর্ণ এবং উৎসুক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলুম।

রমণীবাবু তখন পঁচিশ বৎসরের রমণীমোহন। মাথার ওপর বাপ ছিলেন, দু'বছর আগে পথ পরিষ্কার ক'রে দিয়ে সরে পড়ছেন। কিন্তু

একেবারে পরিষ্কার করেন নি, একটু আগাছার মত রেখে গেছেন নির্মলাকে ! রমণীমোহন বেশি রাত ক'রে ফিরলে নির্মলা ঘরে খিল এঁটে দেয়। বাড়ি এসে একটু গা বমি বমি করলে নির্মলা দূরে দাঁড়িয়ে বাপান্ত করে। একদিন রাগ ক'রে বাপের বাড়ি চলে গেল শোভাবাজারে।

রাগ না লক্ষ্মী ! রমণীমোহনের মহা স্ফূর্তি। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বন্ধুদের সদর আড্ডা বসল বাড়িতে। জোর চলতে লাগল তাস, পাশা, দাবা এবং আনুসঙ্গিক আরো অনেক জিনিষ। মণিকার সামলে সেগুলির নাম করা যায় না। তারপর দাবার ঘোড়ার চাল থেকে মাঠের ঘোড়ার চালের দিকে নজর গেল রমণীমোহনের।

অশ্বিনীরা তো কেবল রূপেই মুগ্ধ করে না, তাদের খুরে রূপার ঝঙ্কার বেজে ওঠে। প্রথম প্রথম বেশ কিছু রোজগার হ'তে লাগল। তারপর সুরু হোল ভাঁটার টান। সে টানে ব্যাঙ্কের হাজার পঁচিশের পুঁজি নিঃশেষিত হোল। বাঁধা পড়ল পৈত্রিক বসত বাড়ি। আর কোথাও টাকার জোগাড় হয় না। এদিকে শনিবার আসন্ন। বন্ধুরা পরামর্শ দিল যাও এবার শ্বশুর বাড়ি। অমন স্বর্ণপ্রভা শ্বশুরকন্যা থাকতে ভাবনা কি। পরামর্শটা পছন্দসই হোল রমণীমোহনের। সেজে গুজে হাজির হোল শোভাবাজারের শ্বশুরালয়ে। যাতে কোন রকম বেচাল ধরা না পড়ে তার জন্য আগে থেকেই সাবধান হয়ে নিল। নির্জলা একাদশী করল পর পর দিন দুই। আমিষের মধ্যে মাছ আর মাংস ছাড়া কিছুই গ্রহণ করল না। তবু আরো বিশুদ্ধ হবার জন্য হরতুকী লবঙ্গ মুখে পুরে হাজির হোল স্ত্রীর কাছে। স্ত্রীকে যথাবিধি আদর আপ্যায়ন জানিয়ে বলল, 'দেখ একটা কথা আছে।'

'কি কথা !'

'বড় বিপদে পড়েছি।'

'তা জানি।'

'কিন্তু কত বড় বিপদ তা জানো না। এক কাজ করো শ' কয়েক টাকা আমাকে দাও।'

'আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।'

'তা ঠিক। তামার পয়সা তুমি রাখতে যাবে কোন দুঃখে। তুমি তো আর গরীবের মেয়ে নও। তাহলে এক কাজ করো, তোমার ওই হার ছড়াই দু'দিনের জন্য ধার দাও আমাকে। কাজ উদ্ধার হয়ে গেলে তিন দিনের দিন আমি তোমাকে তোমার জিনিষ ফিরিয়ে এনে দেব।'

নির্মলা পাশ ফিরে 'শুল, উঁহু, ওসব মতলবও ক'রোনা। অমন কাঁচা মেয়ে আমাকে পাওনি।'

রাগে গা জ্বালা ক'রে উঠল রমণীমোহনের। ভাবল পাকা মেয়ের গলাটা দু'হাতে আচ্ছা ক'রে টিপে ধরে। কিন্তু রমণীমোহনও কাঁচা ছেলে নয়। মনে মনে ঠিক করল অত অধীর হলে চলবেনা। গলা টিপে না ধ'রে স্ত্রীর গলা জড়িয়ে ধরল রমণীমোহন। আদর সোহাগে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে প্রায় একটা বাজল। তবু আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রমণী। ঘুমটা পাকুক। তারপর আড়াইটে নাগাদ আস্তে আস্তে হারছড়া যেই তুলতে যাচ্ছে নির্মলা তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল 'চোর চোর।'

রমণীর শ্বশুর শ্বাশুড়ী পাশের কামরার দরজা খুলে ছুটে এলেন।

'কই চোর কোথায়।'

নির্মলা একটু মাত্র সঙ্কোচ করলনা, আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল রমণীমোহনকে, বলল, 'আমার গায়ের সমস্ত গয়না চুরি ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল।'

রমণীকে কেবল মারতে বাকি রাখলেন রমণীর শ্বশুর ভুবনমোহন, দরজার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও। বদমায়েসী আমরাও অনেক করেছি, কিন্তু তোমার মত এমন বজ্জাত আমরা কোনদিন ছিলাম না।'

ফিরে এসে রমণীমোহন ভাবল আবার বিয়ে করবে। কিন্তু তার আগে শনিবার এসে পড়ল। আর পরের শনিবার পর্যন্ত বিক্রী হয়ে গেল বাড়ি, আসবাবপত্র, সোনাদানা যেখানে যা কিছু ছিল। সেই

সঙ্গে বন্ধুদেরও আর কোন পাত্তা মিলল না। খাওয়া জোটে না এ হেন অবস্থা। একদিন উপোস ক'রে থেকে সমস্ত মান সম্মান ভুলে রমণী ভর্ত্তি হোল এক স্বর্ণকারের দোকানে। পঁচিশ টাকা মাইনেয়। সারাদিন আটকা থাকতে হয় পরের চাকুরিতে। ভালো কাজকর্ম শেখেনি বলে মালিকের ধমক খেতে খেতে প্রাণান্ত। এমনি ক'রে কাটল প্রায় মাসখানেক। তারপর একদিন রাত আটটার সময় দোকান থেকে ফিরে এসে দেখে নির্মলা এসে হাজির হয়েছে ঘরে। পরণে দামী শাড়ি, গা ভরা গহনা। কিন্তু স্ত্রীকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল রমণীমোহন, বলল, বেরোও, বেরোও আমার বাড়ি থেকে।'

নির্মলা হেসে বলল, 'তবু যদি নিজের বাড়ি হোত।'

ভারি দুঃখ লাগল রমণীর মনে। বাড়ির বর্তমান মালিক গোটা বাড়িতে ভাড়াটে বসিয়েছে। কেবল একখানা ঘর দয়া ক'রে দশটাকা ভাড়ায় ছেড়ে দিয়েছে রমণীকে।

রমণীমোহন বলল, 'কিন্তু এ ঘরখানা তো আমার। এখান থেকে তোমাকে বেরুতে হবে।'

নির্মলা বলল, 'ইস্ বললেই বেরুলাম আর কি। এঘর আমারও।'

সারারাত নির্মলা সাধাসাধি করল, কিন্তু রমণী মোটেই মুখ ফিরাল না তার দিকে। ভোরে উঠে ফতুয়া গায়ে কাজে বেরুতে যাচ্ছে, নির্মলা এসে পথ আগলে ধরল, হাতে বড় একটা পুঁটুলী। সারা গায়ে কেবল গায়ের রংটুকু ছাড়া সোনার চিহ্ন মাত্র নেই। দু'হাতে শুধু দু'গাছি শাঁখা আর লোহার বয়লা।

রমণী বিস্মিত হয়ে বলল, 'একি, এসব কি।'

নির্মলা বলল, 'তুমি পরের চাকরি আর করতে পারবে না। ওতে কি পেট ভরে। এসব বাঁধা বিক্রী দিয়ে নিজে দোকান কর।'

চোখে জল এসে পড়ল রমণীমোহনের, 'কিন্তু নিমু, আমি ফের যদি সব উড়িয়ে দিই।'

নির্মলা বলল, 'দাও। সেও বরং ভালো। তুমি কালি ঝুলি মেখে দিন মজুরী করবে, আর আমি এক গা গয়না পরে তোমার সুমুখ

দিয়ে ঘুরে বেড়াব। তার চেয়ে তুমি উড়িয়েই দাও আমার যা আছে। একবারের বেশি তো আর পারবে না।'

কাহিনী শেষ ক'রে রমণীবাবু আমাদের দিকে তাকালেন। দেখলুম চোখ তুটো ছল ছল করছে তাঁর, মুখে কিন্তু সেই পরিতৃপ্তির হাসি।

রমণীবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছিল কল্যাণবাবু, একবারের বেশী মানুষ ওড়াতে পারে না। তারপর বছর পাঁচেকের মধ্যেই নির্মলা জুয়েলারী থেকে নির্মলার সব জিনিষই আমি ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। কিন্তু তার ঋণ কি আর জীবনে শেষ করতে পারব। এখনো দোকান প্রতিষ্ঠার দিনটিতে একখানা ক'রে জিনিষ স্ত্রীকে না দিলে মনে শান্তি পাইনে। সে অবশ্য নিতে চায় না। বলে পাঁচ ছেলের মা হয়ে গেছি আর কেন। আমি বলি পাঁচ ছেলের মাই হও, আর সাত নাতি নাতনীর দিদিমাই হও, তুমি আমার কাছে যে নিমু, সেই নিমু।' কোচার খুঁটে চোখের জল মুছলেন রমণীবাবু।

আমি আর মণিকা এতক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম কখন যে ছটা বেজে গেছে খেয়ালই নেই। ঘণ্টার শব্দ পর্যন্ত কানে যায়নি। মণিকার মুখের সেই ভার ভার ভাব অনেকক্ষণ কেটে গেছে। মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন আরো বেশি সুন্দর বলে মনে হোল স্ত্রীকে। মনে মনে কল্পনা ক'রে নিলুম হারগাছা পেয়ে খুসির প্রাবল্যে এ মুখ আরো কত অপূর্ব দেখাবে।

রমণীবাবু ঘড়ির দিকে চেয়ে ভিতরের দিকে মুখ ক'রে হাঁক দিলেন 'কই ক্ষীরোদ, আর তো ওঁদের বসিয়ে রাখতে পারিনে।'

'এই যে বাবু, হয়ে গেছে।'

মিনিট খানেকের মধ্যেই ক্ষীরোদ নতুন প্যাটার্ণের হার ছড়া নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অবিকল সেই প্যাটার্ণ অনুযায়ী হয়েছে হার।

ক্ষীরোদের হাত থেকে জিনিষটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে রমণীবাবু বললেন, 'দেখুন তো মালক্ষ্মী, পছন্দ হলো কিনা। পরুন, পরে দেখুন।'

মণিকা লজ্জিত মুখে আমার দিকে তাকাল।

মৃদু হেসে বললুম, পরোনা।'

হার পরবার পর রমণীবাবু বললেন, 'দেখুন, কি রকম মানিয়েছে। যান না মালক্ষ্মী, ওই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন।'

ব্যাগ খুলে টাকা বের ক'রে দিয়ে আমি উঠে দাঁড়ালুম। মণিকা রমণীবাবুর দিকে চেয়ে বলল, 'আয়নার সামনে গিয়ে দেখার দরকার হবে না আর। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেল। আমাদের আবার সিনেমার টিকেট কাটা ছিল কিনা সঙ্গে। শো বোধ হয় অনেকক্ষণ আরম্ভ হয়ে গেছে।'

রমণীবাবু বললেন, 'দেখুন দেখি কত ক্ষতি হয়ে গেল। ক্ষতি কি আমারই কম হয়েছে মনে করেন?'

কারিগর ক্ষীরোদ ফিরে যাচ্ছিল নিজের জায়গায়, হঠাৎ রমণীবাবু তাকে ধমক দিয়ে দাঁড় করালেন, 'এই শোন।'

ক্ষীরোদ সভয়ে মনিবের সামনে থেমে দাঁড়াল। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের রোগাটে চেহারার একটি যুবক। গায়ের রং ঘোর কালো। মুখ ভরা ছোট ছোট বসন্তের দাগ। চোখ দুটো লালচে হাত দুটো ময়লা। এতক্ষণ এই লোকটির অস্তিত্ব আমরা ভুলেই ছিগাম এবার চোখ মেলে তাকালাম।

রমণীবাবু বলেন, 'কাজ শেষ করতে এত দেরি করলে কেন? পাক্কা আড়াই ঘণ্টা দেরি হয়েছে তোমার।'

ক্ষীরোদ বলল, 'আজ্ঞে, আরো কতকগুলি জিনিষ শেষ করতে হোল যে।'

রমণীবাবু মাথা নাড়লেন, 'উঁহু, মিথ্যে কথা বলছ। কতকগুলি নয়, দু'দিন ধ'র একটি জিনিষ লুকিয়ে লুকিয়ে শেষ করছিলে। ভেবেছ আমি কিছুই দেখতে পাইনি, না? ওহে, তোমাদের তিন জনের তিন জোড়া চোখ, আর আমার একারই ছ' জোড়া। নইলে তোমাদের আর চড়িয়ে খেতে পারতুম না, লুকিয়ে লুকিয়ে কার জন্য কি সামিগ্রী তৈরী করছিলে, দেখি, বার কর।'

আমি বললুম, 'আহা ছেড়ে দিন। কাজ তো আমাদের হয়ে গেছে।'

রমণীবাবু বললেন, 'আপনাদের হয়ে গেছে; কিন্তু আমার অনেক ক্ষতি হয়ে গেল। যাও নিয়ে এস, কি করছিলে দেখি।'

ক্ষীরোদ বলল, 'আজ্ঞে কিচ্ছু না।'

'কিচ্ছু না? আচ্ছা। প্রফুল্ল, ফটিক! ক্ষীরোদের বসবার জল চৌকিটার তলায় ও কি জিনিষ হে? নিয়ে এসো। সত্যি কথা বল। না হ'লে আমি কাউকে ছেড়ে দেব না। আনো।' রমণীবাবু গর্জে উঠলেন।

যে আমাদের চা এনে দিয়েছিল সেই প্রফুল্লই জিনিষ ছুটো নিয়ে এলো হাতে ক'রে। এনে রমণীবাবুর হাতে দিল।

রমণীবাবু জিনিষ ছুটি আমাদের দিকে তুলে ধরলেন, 'দেখুন, কাণ্ড দেখুন হারামজাদার। এমনি ক'রেই সর্বনাশ করছে আমার।'

চেয়ে দেখলুম। ব্রোঞ্জের ওপর পুরোণ সোনার ছু'গাছি চুড়ি। এখনো সব কাজ শেষ হয় নি।

রমণীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব হচ্ছিল কি শুনি? এ চুড়ি কার?'

ক্ষীরোদের বদলে প্রফুল্লই জবাব দিল, 'আজ্ঞে ওর স্ত্রীর। বিয়ের সময় কেবল একটা টাকা দিয়ে বউয়ের মুখ দেখেছিল ওর মা। সোনাদানা কিছু দিতে পারেনি। সেই জন্যই নিজের পুরোণ সোনা বের ক'রে দিয়েছে। আমরা এতবার বললুম ক্ষীরোদ, এখন থাক, এখন থাক। কিন্তু আজই নাকি ওর দরকার। শ্বশুরবাড়ি থেকে লোকজন আসবে—'

রমণীবাবু এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে ক্ষীরোদের দিকে তাকিয়ে, বললেন 'হুঁ, লোকজন আমি আসাচ্ছি। এ চুড়ি রইল আমার কাছে। যাও কাজ করো গিয়ে। রাহা আর মল্লিকদের ছুটো অর্ডার শেষ ক'রে দিয়ে কাল এসে এ চুড়ির খোঁজ ক'রো আমার কাছে। যত সব বে আক্কেল, ফাঁকিবাজ—'

চুড়ি ছুটো নিজের ফতুয়ার পকেটে রেখে দিলেন রমণীবাবু, তারপর আমাদের দিকে চেয়ে জোড়হাতে নমস্কার জানিয়ে ঠিক আগের

মতই মধুর সৌজন্যে হাসলেন, 'আচ্ছা, নমস্কার। মনে রাখবেন দয়া ক'রে।'

মণিকা দোকান থেকে বেরিয়ে পুব দিকে পা বাড়াল।

বললুম, 'ওকি, চল কলেজ ষ্ট্রীটের মোড় থেকে শ্যামবাজারের বাস নিই।'

আমি তাকালুম মণিকার দিকে। তার গলায় দুলছে রমণীবাবুর দোকানের সেই হার। বড় লকেটটা বক্ষমণির মত ঝুলে রয়েছে।

আমার চোখের দিকে একবার চেয়ে মণিকা গলার হার খুলে ভেলভেট আঁটা ছোট্ট কেসটার মধ্যে ভরে রাখতে রাখতে বলল, 'না, ভালো লাগছেনা, চল বাসায় ফিরি। আচ্ছা একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি।'

'বল।'

রমণীবাবু আর তার বউয়ের গল্পটা কি সত্যি না বানানো :'

মণিকার ম্লান বিষণ্ণ মুখের দিকে চেয়ে আমি চুপ ক'রে রইলুম। বুঝতে পারলুম না, কি বললে মণিকা খুসি হবে।

॥ অপঘাত ॥

সারা মহকুমা সহরটি সরকারী হাসপাতালের সমুখে এসে ভেঙে পড়ল। একটু আগে খবর পাওয়া গেছে ভুখ মিছিলের ওপর পুলিশের লাঠি চার্জের ফলে যারা গুরুতর রকমে জখম হ'য়েছিল তাদের মধ্যে হরপ্রসন্ন হাই স্কুলের মাষ্টার সুধীর দাসের স্ত্রী, বেলা দাস মারা গেছেন। আরো দু'তিন জনের অবস্থাও আশঙ্কা জনক।

বহুলোক জোর করে হাসপাতালে ঢুকে পড়তে চাইছিল। অনেক কষ্টে পুলিশ পাহারায় সরকারী কর্মচারীরা তাদের বাধা দিয়ে রেখেছে।

কয়েকজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সবিনয়ে হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন।'

জনতার ভিতর থেকে অনেকগুলি অসহিষ্ণু কণ্ঠ শোনা গেল, 'ধৈর্য। এর পরেও ধৈর্য ধরতে বল তোমরা! লজ্জা ক'রে না।

'লজ্জা বলতে ওদের কিছু আছে নাকি?'

এবার সরকারী হাসপাতালের সবচেয়ে বড় ডাক্তার এগিয়ে এসে অনুনয় করে বললেন, 'আপনারা যদি এখানে গোলমাল করেন, আহতদের চিকিৎসার অসুবিধা হবে। দয়া ক'রে একটুকাল অপেক্ষা করুন আপনারা। যা যা দাবী করা হয়েছে সবই গভর্ণমেণ্ট মেনে নেবেন। খানিক বাদে সবাইকেই ভিতরে আসতে দেওয়া হবে। শহীদদের শবদেহ নিয়ে শোভাযাত্রায়ও গভর্ণমেণ্ট বাধা দেবেন না। কিন্তু একবার আমাদের শেষ চেষ্টা করতে দিন। দেখি এদের বাঁচিয়ে তোলা যায় কিনা।'

জনতার ভিতর থেকে ফের ব্যঙ্গমিশ্রিত মন্তব্য শোনা গেল। 'গুলী করে লাঠি মেরে মানুষকে বাঁচাতে চাও তোমরা। আহাহা, বাঁচাবার কি ওষুধই না বের করেছ।'

ডাক্তার অবিচলিতভাবে বললেন, 'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।'

পিছন থেকে কার যেন গলা শোনা গেল, 'কিন্তু নাভিশ্বাসের বেলায় সে কথা খাটে না।'

এবার সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে চেষ্টা ক'রলেন।

বিমূঢ় অভিভূত সুধীর ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা ক'রছিল, ফার্ষ্ট ক্লাসের একটি লম্বাপানা ছাত্র এসে বলল, 'এই যে মাষ্টার মশাই আপনি এখানে। আমরা অনেকক্ষণ ধরে আপনাকে খুঁজছি। আপনার মা আপনাকে বাসায় যেতে বলেছেন। ছেলেমেয়েরা ভারি কাঁদাকাটি করছে। আপনার মা কিছুতেই তাদের সামলে রাখতে পারছেন না। যা হবার তা তো হয়েছে। আপনি বাসায় যান। ওদের দেখুন গিয়ে। বেলাদির জন্য আমরা এখানে রইলাম।'

ছেলেটির সঙ্গে পরিচিত আরো কয়েকজন ভদ্রলোক সুধীরকে বাসায় যেতে অনুরোধ করলেন।

সুধীর আস্তে আস্তে বাসার দিকে এগিয়ে চলল, জন দুই ছাত্র তার সঙ্গে আসতে চাইছিল, সুধীর তাদের দিকে ফিরে বলল, 'আমি একাই যেতে পারব। তোমাদের আর আসার দরকার নাই।'

হাসপাতাল, আদালত, হাইস্কুল ছাড়িয়ে, বাজার, পোষ্ট অফিস, থানা পার হ'য়ে সহরের একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে সুধীরের বাসা। সহরের সমস্ত লোক রাস্তায় নেমেছে। মেয়ে পুরুষ সবাই এগিয়ে চলেছে হাসপাতালের দিকে, যেতে যেতে সুধীরকে অনেকেই জিজ্ঞেস করল, 'আপনার স্ত্রীর খবর কি মশাই?'

সুধীর কখনও ঘাড় নেড়ে কখনও সংক্ষেপে জবাব দিতে দিতে চলল, 'হয় গেছে।'

একজন বৃদ্ধ বলে উঠলেন, 'আহাহা! এসব খুনের দল কোত্থেকে এল বলুন তো?'

সুধীর কোন কথা বলল না।

কে একজন জবাব দিল, 'আসবে আবার কোত্থেকে, এরা নাকি এদেশেরই। আর একজন বলল, 'এরা সব সেকেলে স্বদেশী।'

সুধীর নীরবে এগিয়ে চলল।

পুরোন একতলা বিবর্ণ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াতেই সুধীরের বুড়ো মা হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'আমার কি সর্বনাশ হোলোরে। ওরে কি সর্বনাশ হয়ে গেল আমার। ডাকাতরা আমার ঘরের লক্ষ্মীকে খুন ক'রে ফেলল। এখন এই দুধের বাচ্চাগুলিকে আমি বাঁচাব কি করে!'

চারটি ছেলে মেয়ে একটু বুঝি শান্ত হয়েছিল। ঠাকুরমাকে গলা ছেড়ে কাঁদতে দেখে এবার তারাও ফের চেঁচিয়ে উঠল।

পাঁচ বছরের মেয়ে টুনি সুধীরের কাছে দাবী করল, 'মা কোথায়, মাকে কোথায় রেখে এলে বাবা। তাকে নিয়ে এসো।'

তিন বছরের বিস্তু বায়না ধরল, 'আমি মার কাছে যাব, বাবা আমি মার কাছে যাব।'

জনকয়েক প্রতিবেশীর বউ এসে ওদের শান্ত করতে চেষ্টা করল।

পাশের বাসার বিনোদ উকিলের মা বিন্দুবাসিনী, সুধীরের মাকে বললেন, 'আপনি নিজেই যদি এমন অস্থির হয়ে পড়েন দিদি ওদের সামলাবে কে? যান, ছেলে এসেছে। এবার সবাইকে নিয়ে ঘরে যান।'

সুধীরের মা সৌদামিনী ফের কেঁদে উঠলেন, 'ঘর কোথায় দিদি, কোন মুখে আর গিয়ে উঠব সেখানে। সর্বনাশী যে আমার সমস্ত ঘর সংসার জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কি দরকার ছিল, কি দুঃখ ছিল তোর। রোজগেরে স্বামী, সোনার চাঁদ সব ছেলে মেয়ে। এদের ফেলে কেন তুই রাস্তায় বেরোলি। মেরেছে বেশ করেছে। এমন দস্যি বউকে মারবে না, ছেড়ে দেবে তারা? যে বউ ঘর ছেড়ে স্বদেশী করতে বেরোয় সে আবার বউ। খুন করেছে বেশ করেছে, আমি খুসি হয়েছি।'

বিন্দুবাসিনী বললেন,—'আঃ দিদি, থামুন, থামুন। পাগল হয়ে গেলেন নাকি আপনি!'

সৌদামিনী একথায় কোন জবাব না দিয়ে সুধীরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব ওর দোষ। সব আমার এই কপালের দোষ। সব আমার ওই মেনিমুখো হারামজাদার দোষ। ও কি পুরুষ। ও যদি পুরুষ হোত তাহলে কি ওর ঘরের বউ এমন করে মিছিলে বেরোয়। তাহলে কি ওর ঘরের বউকে পরে এসে লাঠি মারতে পারে?'

সুধীর এগিয়ে এসে মার হাত ধরল, তারপর বিরক্ত ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে আর নয়, চল, ঘরে চল মা।'

সৌদামিনা বললেন, 'না যাব না। আমি আর ওঘরে যাব না, নিজের বউকে ঘরে বেঁধে রাখতে পারলিনে, আর আমাকে তুই ঘর দেখাচ্ছিস। আমি কোন মুখে ঘরে যাব। আমি তোকে গোড়া থেকে বলিনি, পই পই করে নিষেধ করিনি, সুধীর বউয়ের লাগাম অমন করে ছেড়ে দিসনি। আমি তোকে বারবার সাবধান করে দিইনি সর্বনাশী একটা কিছু ঘটাবে। অপঘাত মৃত্যুই টানছে সর্বনাশীকে। যারা একবার অপঘাতে মরবার চেষ্টা করে, মরতে মরতে তারা অপঘাতেই মরে। গলায় দড়ি তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়ায় আমি বলিনি তোকে? আমার কথা তো তুই শুনলিনে—'

প্রতিবেশীরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। সুধীরের আর সহ্য হোল না। জোর করে মাকে ধরে ভিতরে নিয়ে গেল, ছেলেমেয়েরা গেল পিছনে পিছনে।

ওদের দিকে না তাকিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল সুধীর।

বেলার নিজের হাতে সুন্দর করে গুছানো ঘর ঠিক তেমনি করে গুছানো রয়েছে। দুরন্ত ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত আজ কোন কিছু ধরে টানাটানি করতে সাহস করেনি। দড়ির আলনায় বেলার খান দুই পুরণো শাড়ি ঝুলানো রয়েছে, তার নীচে ছোট র‍্যাকটিতে সুধীরের বইপত্র গুছানো। বইগুলি শুধু সুধীরের নয়, অবসর সময়ে আজকাল বেলাও নিয়ে পড়ত। ঘরের তিন দেওয়ালে দুটি করে তাক। পৈতৃক

আলমারীটা দুর্ভিক্ষের বারে বিক্রী করে দিয়েছিল সুধীর। তারপর আর কিনতে পারেনি। খোলা তাকগুলিকে দিয়েই আলমারীর কাজ চালাতে চালাতে কতদিন কত বক বক করেছে বেলা। কিন্তু কোন জিনিষই অগোছালো রাখেনি। গোটা পাঁচেক আচারের বৈয়ম, ডজন খানেক কাঁচের গ্লাস, জলের কুঁজো, বাইরের কোন অতিথি অভ্যাগত এলে তাদের জন্য রঙীন প্ল্যাষ্টিকের একটু সৌখীন ধরনের কিছু চায়ের কাপ-ডিস, সংসারের আরো অসংখ্য টুকিটাকি জিনিষ নিজের হাতে সযত্নে গুছিয়ে রেখে গেছে বেলা। পশ্চিমের দেওয়ালে ওপরের তাকে বেলার আয়না, চিরুণী, সিন্দুর কৌটা, নিঃশেষিত প্রায় স্নোর শিশি আর পাউডারের বাটিটাও রয়েছে। চিরুণীর ডগায় একটুখানি সিন্দুর লাগানো। মিছিলে বেরুবার আগে বোধ হয় সিঁথিতে একটু সিন্দুর লাগিয়ে গিয়েছিল বেলা। সীমন্তে সিন্দুর পরতে পরতে একবার হয়ত ওর মনে হয়েছিল সুধীরের কথা।

দিন কয়েক আগে বেলাকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিন্দুর পরতে দেখে সুধীর বলেছিল, 'তুমি তো আজকাল রীতিমত আধুনিকা, রাজনীতি রঙ্গিনী। সিন্দুরের রঙের তোমার আর দরকার কি, সিন্দুর পরবার অত ঘটা কেন তোমার?'

মৃদু হেসে বেলা ঘাড় ফিরিয়েছিল, 'সিন্দুর কি আমি নিজের জন্যে পরি নাকি?'

'তবে কার জন্যে?'

বেলা বলেছিল, 'সিন্দুর মেয়েরা কার জন্যে পরে জানো না। সিন্দুরে পুরুষের আয়ুবৃদ্ধি।'

সুধীর বলেছিল, 'আর মেয়েদের বুঝি কিছুই বাড়ে না?'

কাজের অত তাড়ার মধ্যেও বেলা সিঁথিতে সিন্দুর ছোঁয়াতে ভুলে যায়নি। সুধীরের ভাবতে ভালো লাগল।

সব ঠিক তেমনি আছে। ঘরের চেহারার কোন কিছুরই বদল হয়নি। এমন কি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়া লোহার সেই হুকটা পর্যন্ত অক্ষয় অক্ষত হয়ে রয়েছে। এই হুকে শাড়ি পাকিয়েই সেবার

গলায় ফাঁস এঁটে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল বেলা। সেই প্রথমবার অপঘাতে মরতে গিয়েছিল।

সেই তেরশ পঞ্চাশ সনের কথা। সাত সাতটা বছর কেটে গেছে তারপর? কিন্তু সেই বিভীষিকা ভরা অন্ধকার রাতটার কথা সুধীর আজও ভুলতে পারেনি। সে স্মৃতি কি ভুলবার?

দেশ জুড়ে ছুর্ভিক্ষ লেগেছে। ষাট টাকা দরে বিক্রী হচ্ছে চালের মণ। কিন্তু অত চড়া দামেও কেউ আর চালের নাগাল পাচ্ছে না। সব নাকি কালো বাজারে অদৃশ্য হয়েছে। সুধীরদের সহরের মুদি দোকানগুলিও চাল আটা শূন্য। বাজারে একটা ক্ষুদ পর্যন্ত কুড়িয়ে পাওয়া যায় না। সহর ভরে হাহাকার উঠেছে। সহরতলীর মুচি মুদ্দফরাসের দল বেশির ভাগই দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। যারা আছে তারাও কচু সেদ্ধ, সাপলা সেদ্ধ খেয়ে কলেরায় প্রায় সাফ হবার জো হয়েছে। কেরাণী আর মাষ্টারদের পাড়াতেও সেই দশা। ছবেলা ছমুঠো জুটছে এমন লোকের সংখ্যা কম।

'কিন্তু তাই বলে তোমার মত কেউ নয়, কোন ভদ্রলোক ছেলেপুলে নিয়ে তোমার মত এমন উপোস করে নেই,' কটু কণ্ঠে স্বামীর মুখের উপর সেদিন বলেছিল বেলা।

সুধীর জবাব দিয়েছিল, 'সাধ ক'রে, কি আর উপোস ক'রে আছি। না মিললে করব কি, দেশশুদ্ধু লোকেরই তো এই দশা।

বেলা বলেছিল, 'দেশের খবর আমি জানতে চাইনে। যেমন ক'রে হোক কয়েক সের চাল আমার চাই। চোখের সামনে ছেলে মেয়ে ছটো শুকিয়ে মরবে তা আমি দেখতে পারব না।'

সুধীর বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'তা দেখতে না পার চোখ বুজে থাক। এক বেলা না খেয়ে থাকলেই তোমার ছেলে মেয়ে যদি মরে মরুক।'

'একথা তুমি বলতে পারলে? বাপ হয়ে একথা বলতে তোমার লজ্জা করল না?'

'এ লজ্জা আজ দেশ শুদ্ধু বাপের। আমার একার নয় বেলা।'

বেলা তিক্ত কণ্ঠে বলেছিল, 'কেবল দেশ আর দেশ। দেশের দোহাই দিয়ে নিজের অক্ষমতা ঢেকে রাখবে বুঝি ভেবেছ?'

সুধীর বলেছিল, 'তোমার ক্ষমতার বহরটাও সেই সঙ্গে দেখতে পারব।'

বলে সুধীর লঙক্লথের পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়েছিল।

সৌদামিনী পিছন থেকে ডেকে বলেছিলেন, 'এই ভর সন্ধ্যায় কোথায় চললি তুই।'

সুধীর মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিয়েছিল, 'যমেরবাড়ি।'

যমের বাড়ি নয়, চালের আড়তদারের বাড়ি থেকে বিয়ের আংটি বিক্রি ক'রে কুড়ি টাকায় দশ সের চাল সংগ্রহ করে রাত গোটা দশেকের সময় ঘরে ফিরে এসেছিল সুধীর। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর সৌদামিনী এসে সদর খুলে দিয়ে দুর্বল দেহে ফের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লেন। নাতি নাতনী দুটি তাঁরই সাথে মরার মত পড়ে রয়েছে।

সুধীর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'বেলা কই?'

সৌদামিনী ক্ষীণ কিন্তু বিরক্ত স্বরে বললেন, 'কি জানি বাপু। সন্ধ্যার পর পাড়ায় কোথায় বেরিয়েছিল, ফিরে এসে নিজের ঘরে খিল দিয়ে ঘুমুচ্ছে না কি করছে সেই জানে।'

দোরে জোরে জোরে ঘা দিয়ে সুধীর স্ত্রীকে ডেকেছিল, 'ঘুমিয়ে থাকলে হবে না কি, ওঠ, উঠে রান্না চড়াও।'

কিন্তু বেলা কোন সাড়া দেয়নি।

একটু কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ভিতর থেকে অদ্ভুত একটা গোঁ গোঁ শব্দ কানে যেতেই জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সুধীর। জানলার একটা পাট হয় ভুলে না হয় ইচ্ছা ক'রেই বেলা খুলে রেখেছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে একবার তাকিয়েই সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠেছিল, 'মা ওঠ, ওঠ, সর্বনাশ হয়ে গেল।'

সে আর্তনাদে শুধু সৌদামিনীই উঠলেন না, আশে পাশের বাড়ি থেকে পাড়াপড়শীরাও সব ছুটে বেরুলেন। দোর ভেঙে ঘরে ঢুকে

চরম সর্বনাশ থেকে সবাই সে যাত্রা বেলাকে রক্ষা করেছিল। ফাঁসটা অনেকখানি আটকে জিভ বেরিয়ে পড়েছিল। আর এক মুহূর্ত দেরি হ'লে সব শেষ হয়ে যেত।

প্রাণ সে যাত্রা রক্ষা পেল বেলার। কিন্তু মান রক্ষা পেল না। না তার নিজের না সুধীরের। বেলার গলায় দড়ি দেওয়ার খবরটা সহরময় রটে গেল। থানার কনেষ্টবল কানাই নন্দী পাড়াতেই থাকে, সেও এল খোঁজ খবর নিতে। সুধীরের প্রবীণ হিতৈষীরা তার হাতে কিছু দিয়ে দিতে বললেন। পাছে এ নিয়ে আর কোন রকম গোলমাল বাধে।

সুধীর রাগ করে বলল, 'বাধুক গোলমাল। থানা পুলিশ হোক, ওর শাস্তি হোক, তাই আমি চাই।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকা দক্ষিণা দিয়ে কনেষ্টবলকে ঠাণ্ডা করতে হোল সুধীরকে।

কিছুদিন ধরে অনেক রকম রটনা হতে লাগল পাড়ায়। কেউ বলল ঘটনার দিন সন্ধ্যার পর বেলাকে সেজেগুজে বেরুতে দেখেছে। কেউ কেউ বলল ঘটনার দিন মধু পোদ্দারের বাড়ির ওদিক থেকে বেলা অনেক রাত্রে ফিরে আসছিল। মধু পোদ্দারের বাড়ি চালের চেষ্টায় গেলে শুধু হাতে ফিরে আসতে হয় না, কিন্তু মেয়েদের যা সবচেয়ে বড় জিনিষ তা রেখে আসতে হয়। বেলা যে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল তার মূলে নাকি তার সেই সম্মান খোয়াবার লজ্জা। কিছুকাল ধরে বেলাকে নিয়ে এ ধরণের আরো নানা রকমের গল্প কাহিনী পাড়া ভরে রটতে লাগল।

দুজনেই কান পেতে শুনল। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না।

খানিকটা সুস্থ হবার পর বেলা একদিন স্বামীকে বলল, 'তুমি এসব বিশ্বাস করছ?'

সুধীর জবাব দিল। 'আমার বিশ্বাস করায় না করায় কিছু এসে যায় না। হাটে, বাজারে, অফিসে, আদালতে তোমার জন্যে কোথাও মুখ দেখাবার জো নেই। দেশ থেকে আমাকে এবার চলে যেতে হবে।'

বেলা অনুতপ্ত স্বরে বলল, 'তার চেয়ে আমাকে কেন চলে যেতে দিলে না। কেন আমাকে বাঁচাতে গেলে। সব আপদ বালাই নিয়ে আমি মরে যেতাম, তোমাকে রেহাই দিয়ে যেতাম—'

সুধীর বলল, 'থাক, যেতে দাও ওসব কথা।'

কিন্তু যেতে দিতে চাইলেই কি সব কথা জীবন থেকে চলে যায়? বেলার এই কলঙ্কের কথাটাও একেবারে গেল না! অভাব অনটন নিয়ে কোন কথান্তর হলেই সুধীর স্ত্রীকে খোঁটা দিত। 'তোমাকে কিছু বলতেই ভয় হয়, আবার কোন্ দিন দড়ি নিয়ে ঝুলে পড়বে।'

সৌদামিনীও বলতেন, 'থাক থাক, অমন গুণের বউকে আর ঘাঁটিয়ে দরকার নেই সুধীর। কখন আবার কোন্ কীর্তি করে বসবে, বাড়িশুদ্ধু লোকের দড়ি পড়বে হাতে।'

মেঝো ছেলে ছ' বছরের বিনু পর্যন্ত একদিন মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আচ্ছা মা, তুমি নাকি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলে?'

'কে বলল তোকে?'

'আমি ঠাক্‌মার কাছে শুনেছি। ভারি মজার না? আর একদিন দেবে গলায় দড়ি? আমি দেখব।'

একটু চুপ করে থেকে বেলা জবাব দিয়েছিল, 'আর একদিন কেন গলায় দড়ি দিতে আমার প্রায়ই ইচ্ছা করে। কেবল তোদের জন্যেই দিতে পারিনে।'

নাছোড়বান্দা বিনু আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে মার গলা, 'আমরা কিছু বলব না মা, তুমি চুপি চুপি আর একবার দাও আমরা দেখি।'

রঙীন পেনশিল দিয়ে স্কুলের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে, মা আর ছেলের আলাপ সুধীর একবার কান খাড়া করে শোনে। তার পর ফের বড় বড় কাটা চিহ্নে গোটা পাতাকে কণ্টকিত করে তোলে।

বারান্দায় বসে মালা জপ করতে করতে সৌদামিনী বলেন, 'কেন কিসের এত দুঃখ তোমার শুনি যে বার বার দড়ির কথা বল, দড়ির

ভয় দেখাও, ওই দড়িতেই তোমাকে টানছে, তা আমি বলে দিলাম। ওই দড়িতেই তুমি যাবে।'

বেলা ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ ক'রে থাকে কোন জবাব দেয় না।

পাড়ার বিনোদ উকিলের বাড়িতে দুপুরের পর মাঝে মাঝে তাসের আসর বসত। মোক্তার, ডাক্তারের স্ত্রীরা গিয়ে জড়ো হোত বিনোদবাবুর স্ত্রী মন্দাকিনীর বৈঠকে। পঞ্চাশ টাকা মাইনের মাষ্টারের স্ত্রী বলে সে আসরে বেলার তেমন মর্যাদা ছিল না। কিন্তু তাসে সব চেয়ে ভালো হাত ছিল বলে শশী মোক্তারের স্ত্রী সুরবালা শ্রীপতি ডাক্তারের স্ত্রী সুহাস, সবাই বেলাকে পার্টনার হওয়ার জন্য টানাটানি করত। বাড়ির খোঁটা আর গঞ্জনার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বড় ছেলে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে পাঠিয়ে ছোটদের শাশুড়ীর কাছে ঘুম পাড়িয়ে রেখে ফের একদিন বেলা গিয়ে হাজির হোল তাসের আসরে। অনেকদিন বাদে বেলাকে দেখে সকলেই খুব আদর আপ্যায়ন করল। দু'এক হাত তাসও জমল বেশ। তারপরই সবাই মিলে সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করতে সুরু করল।

মন্দা বলল, 'আচ্ছা ভাই, সত্যি সত্যি ব্যাপারটা কি খুলে বলতো, তুমি কেন ও কাজ করতে গেলে? তোমার এমন সোনার সোনার, সংসার চাঁদ সব ছেলে মেয়ে, কিসের দুঃখ ছিল তোমার। সুধীর বাবুর মতও তো অমন মানুষ আজকাল দেখা যায় না। দোষের মধ্যে ভদ্রলোকের রোজগার একটু কম—। ডাক্তারের স্ত্রী সুহাস বলল, 'তা পুরুষের রোজগার একটু কম হওয়া মন্দ নয় ভাই, তেজটাও কম থাকে। কম রোজগেরে স্বামীর ঘর করার অনেক রকম সুবিধেও আছে।'

মন্দা হেসে বলল, 'কিন্তু সবচেয়ে বড় অসুবিধা যে সব স্বামীরা খালি হাতে আদর করে, স্যাঁকরার দোকান পর্যন্ত তাদের হাত পৌঁছোয় না। তোমার এই নতুন নেকলেসটা ক' ভরির ভাই, ভরি পাঁচেকের ত হবেই।'

সুহাস গম্ভীর মুখে বলল, 'সোয়া ছ' ভরির।'

পাছে ছুই বন্ধুর মধ্যে হাসিপরিহাসের ভিতর দিয়ে ঝগড়া সুরু হয়ে যায় সেই ভয়ে শশী মোক্তারের স্ত্রী সুরবালা ফের বেলার প্রসঙ্গ তুলল, 'আচ্ছা ভাই পোদ্দার বুড়ো কি বলেছিল তোমাকে? উনি বললেন, সুধীরবাবু নেহাৎই ঠাণ্ডা মানুষ তাই, আর কেউ হলে সহ্য করত না। বুড়োকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে কোর্টে নিয়ে গিয়ে হাজির করত।'

সুহাস বলল, 'তাতে ভাই তোমার আর মন্দার উনির' পকেট ভারি হোত, কিন্তু বেলার কি মান বাঁচত। মেয়েদের মান গেলে আর কি থাকে ভাই।'

সুরবালা বেলার দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি কি সেই মানের ভয়েই—'

বেলা সুরবালার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইল, তারপর পরম শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'না সুরোদিদি গরীব মেয়েমানুষের মান সম্মানের ভয়টা বড় হয় না। তার চেয়ে প্রাণের ভয়টাই বেশি। ছুদিন বাদে না খেতে পেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে শুকিয়ে মরব, সেই ভয়েই আমি মরতে গিয়েছিলাম, আর কিছুর জন্যে নয়।'

বলে বেলা হাতের তাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বেলার কথা বলবার ভঙ্গিটাই, শান্ত, ভাব আর ভাষায় অন্তর্জ্বালা বড় বেশি।'

বেলা ঘর থেকে বারান্দায় নামতেই মন্দার গলা তার কানে গিয়েছিল, 'কথায় বলে ডেঁয়ো পিঁপড়ের বিষ বেশি, এ হোল তাই।'

সুরবালা বলেছিল, 'যা বলেছ। যে কাণ্ড করেছে তাতে কোথায় মাথা নিচু করে থাকবে তা নয়, আবার মুখ তুলে কথা বলে। আমরা হলে তো ভাই মুখ দেখাতে পারতাম না, উনি সেদিন বলছিলেন এসব কেসে জেল পর্যন্ত হয়ে যায়, পাড়ার লোকেরা সব ভদ্রলোক তাই, না হ'লে এতদিন গারদে বসে ঘানি ঘুরাতে হোত।'

সুহাস কি বলে তা শুনবার জন্য বেলা আর দাঁড়ায় নি।

কিন্তু ছু চার পা এগুলেই পিছন থেকে আর একটি মেয়ের গলা ওর কানে গিয়েছিল, 'বেলাদি শুনুন।'

লম্বা কালো মত চশমা পরা উনিশ কুড়ি বছরের একটি মেয়ে। এতক্ষণ মন্দাদের ঘরে একটু দূরে বসে কি একটা মাসিক কাগজের

পাতা উল্টাচ্ছিল। কারো সঙ্গে কোন আলাপ করেনি। বেলা জিজ্ঞেস করে জেনেছিল, মেয়েটি সুহাসের বোন্‌ঝি, কলকাতার কোন্ একটা কলেজে সকালে পড়ে। দুপুর বেলায় আবার নাকি একটা অফিসে টাইপিষ্টের কাজও করে। ছুটিতে মাসীর কাছে এসেছে। শুনে কৌতূহলী হয়ে বারবার মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিল বেলা, কিন্তু মেয়েটি আলাপ করবার কোন আগ্রহ দেখায়নি। হাতের বই থেকে চোখও তোলেনি। কলেজে পড়া দেমাকী মেয়ে ভেবে মনে মনে তার সম্বন্ধে একটা বিদ্বেষেয় ভাবই এসেছিল বেলার। এখন তার মুখে স্নিগ্ধ বেলা দি ডাক শুনে অবাক হয়ে ফিরে তাকাল বেলা।

মেয়েটি বলল, 'আপনার বাসা কতদূরে?

'কাছেই।'

চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। ওঁরা এত গোলমাল করছিলেন যে আপনার সঙ্গে আলাপই করতে পারিনি। চলুন যেতে যেতে কথা বলব।'

কি কথা বলবে তা গোড়া থেকেই টের পেয়েছে বেলা; এও নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে পোদ্দার বুড়ো তার সঙ্গে কি রসালাপ করেছিল। কেবল কি হাতই টেনে ধরেছিল, না আরো খানিকটা এগিয়েছিল। কলেজে পড়া মেয়েই হোক আর ঘর সংসার করা মেয়েই হোক, এ কৌতূহল সকলেরই মজ্জাগত তা বেলার জানতে বাকি নেই।

তাই বেলা প্রথমটা বেশি আমল দিতে চায়নি মেয়েটিকে, বিরষ মুখে বলেছিল, কি কথা বলবেন।

মেয়েটি তার মনের ভাব আন্দাজ করে বলেছিল, 'ভয় নেই আপনার। ওঁরা যে সব কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন তা আমার জানবার কোন আগ্রহ নেই। আপনি যে মুখের ওপর ওঁদের উচিত কথা শুনিয়ে দিয়ে এলেন, তাতে আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে। সেই কথাই জানাতে এলাম আপনাকে।'

যদিও পড়ুয়া মেয়ের মত খানিকটা ছাপানো বইয়ের ভাষায় কথা বলে, তবু ওর ব্যবহারটুকু ভারি ভাল লাগল বেলার।

একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কি?'

'শুক্তি রায়।'

'বেশ নামটি তো!'

শুক্তি হেসে বলল, 'ওই নামটিই শুধু বেশ। প্রশংসা করবার মত আর কিছু নেই, না আপনার মত রঙ, না নাক চোখ—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি দেখে নিয়েছি।'

বেলাও এবার হেসেছিল, 'আহাহা, কিন্তু অত বিদ্যা বুদ্ধি আর অমন সুন্দর স্বভাব, তা তো আর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে পারেন নি।'

'না, এইজন্যেই তো আপনার সামনে দাঁড়িয়েছি। দেখি কিছু দেখা যায় কিনা।'

এমনি করে দুজনের আলাপ। সে আলাপের কথা স্ত্রীর কাছেই সুধীর শুনেছিল। নতুন বন্ধু পেয়ে যেন নব প্রশ্ন, নব যৌবন পেয়েছিল বেলা।

শুক্তি বয়সে যেমন বছর পাঁচ-ছয়ের ছোট, বিদ্যায় পড়াশুনায় তেমনি বড়। কিন্তু এই অসমতা দুজনের বন্ধুত্বে কিছুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। বেলা একটু সঙ্কোচ করলেও শুক্তি অবাধে তার সঙ্গে মিশেছে।

এই মেশামেশি আলাপ আলোচনার ফলেই সহরের মহিলা সমিতির প্রথম উদ্ভব। মেয়েস্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাসের কয়েকজন ছাত্রী, দু'চারজন শিক্ষয়িত্রী নিয়েই এই মহিলা সমিতি প্রথম খুলেছিল। শুক্তি তারপর এসে ধরে পড়েছিল, 'তোমাকেও এর মধ্যে আসতে হবে বেলাদি।'

বেলা ভিতরে ভিতরে খুসি হলেও মুখে বিনয় করে বলেছিল, 'সে কি কথা ভাই, আমি ওসব সমিতি টমিতির মধ্যে গিয়ে কি করব, না জানি লেখাপড়া না জানি কিছু।'

শুক্তি বলেছিল, 'আপাততঃ যা জানো তাতেই চলবে। তারপর নিজের গরজে আরো জেনে নেবে। জানিনে বলে ঘরের কোণে অভিমান ক'রে বসে থাকলে তো আর কিছু জানা যায় না।'

বেলা তবু বলেছিল, 'কিন্তু আমি তো ভাই তোমার মত ঝাড়া হাত-পা নই, স্বামী আছে, সংসার আছে, বুড়ো শাশুড়ি আর ছেলেপুলে আছে—'

শুক্তি হেসে বলেছিল, 'বেশ তো, সেই সঙ্গে তোমার আরো একটি নতুন জিনিষ হবে—সমিতি। দেখবে তার সঙ্গেও তোমার এক নতুন আত্মীয়তা। ঠিক রক্তের সম্পর্ক নয়, আর এক ধরণের সম্পর্ক, কিন্তু তার মধ্যেও রস কম নেই, রঙ কম নেই, সে সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ককে আরো জোরালো করে, আরো মধুর করে।'

বেলা বলেছিল, 'কিন্তু আমার যে বড় ভয় হচ্ছে ভাই, ও সব করতে গিয়ে আমার সংসার যদি মারা যায়।'

শুক্তি বলেছিল, 'ক্ষেপেছ, তোমার সংসার তাতে আরো বাঁচবে। সংসারকে ভালো করে বাঁচাবার জন্যেই তো এই সব সমিতি। এতো ভাই সন্ন্যাসীদের মঠ নয়, যে সংসারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক থাকবে না, আমাদের মঠ সংসারের জন্যেই। ঘর গৃহস্থালীকে আরো আঁটসাঁট মজবুত করে বাঁধবার জন্যই আমরা এই সন্ন্যাস নিয়েছি।'

দেখতে দেখতে বেলা ভিড়ে পড়ল দলে।

সুধীর একদিন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয় তোমাদের ওখানে।'

বেলা জবাব দিল, 'খবরের কাগজ আসে। মাসিকপত্র আসে, বইপত্রও অনেক আনিয়েছে শুক্তি। দেশ বিদেশের কত রকম কত আলোচনা হয়। মাঝে মাঝে শুক্তির একজন বন্ধুও আসেন। ভদ্রলোক নাকি কোন কলেজের প্রফেসর। চমৎকার আলাপী লোক।'

সুধীর বলল, 'এবার তোমার আকর্ষণের কারণটা বুঝতে পারছি।'

বেলা বলল, 'উঁহু কিছুই বুঝতে পারনি। আর কারো কোন আকর্ষণের তিনি ধার ধারেন না। কারো দিকে তেমন ভাবে তাকান না তিনি। অল্প বয়সে কতকগুলি ছেলে পুলে হওয়ায় আমি না হয় বুড়িয়ে গেছি, কিন্তু সমিতিতে সুন্দরী মেয়ে তো আরও আছে। তবু আর কারো দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই প্রভাস বাবুর, থাকবে কি, গাঁট ছড়া যে ভিতরে ভিতরে আর একজনের সঙ্গে বাঁধা। শুক্তির সঙ্গে

শিগগিরই ওঁর বিয়ে হবে, সব ঠিক ঠাক, এখন বাসর ঘরে গিয়ে উঠলেই হয়।'

কিন্তু বাসর ঘরে যাওয়ার আগেই দুজনকে কিন্তু দু মাস আগে পিছে শ্রীঘরে গিয়ে উঠতে হলো। কিন্তু তার আগে দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে। জাতীয় পতাকা আর রঙীন কাগজের ফুল আর শিকলে ঘর সাজিয়ে উৎসব পালন করা হয়েছে সহর ভরে। কিন্তু যত দিন কাটছে তত বেশি করে টের পাওয়া যাচ্ছে সবই যেন কাগজের ফুল আর কাগজী স্বাধীনতা। তাতে রঙ আছে কিন্তু রস নেই।

সমিতিটা উঠি উঠি করেও উঠল না। অনেক মেয়ে ছেড়ে গেল। কিন্তু নতুন নতুন মেয়ে এসেও কম জুটল না। সবাই শিক্ষিতা, স্কুলে কলেজে পড়া মেয়ে নয়। সবাই ঘর ছেড়ে আসতেও পারে না। কিন্তু বেলাই মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের খবর নিয়ে আসে, তাদের দেশ বিদেশের খবর দিয়ে আসে।

সুধীর একদিন বলল, 'দেখ লোকে কিন্তু ভারি হাসাহাসি করছে। আমাদের হেড মাষ্টার মশাই সেদিন বলছিলেন দুর্বল পুরুষের নারীই সবলা হয় বেশি। কথাটা যে আমাকে লক্ষ্য ক'রেই বলা তা সবাই বুঝেছে।'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বেলা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, 'তুমি বললে না কেন মেয়েদের বল দেখে যারা হিংসা করে সেই পুরুষেরাই আসলে দুর্বল। তুমি মোটেই দুর্বল নও।'

সুধীর বলল, 'শুক্তি তোমার কানে কি মন্ত্র দিয়ে গেছে জানিনে, কিন্তু ঘরের বউয়ের এসব রাজনীতি করা কি পোষায়। তোমার ছেলে মেয়ে ঘর সংসারকে যদি ভালো ক'রে গড়ে তুলতে পারো সেই হবে সত্যিকারের দেশের কাজ।'

বেলা বলল, 'তা জানি। কিন্তু নিজের ঘরকেও কি একা একা গড়ে তোলা যায়। আগে ভাবতাম যায় বুঝি, এখন ক্রমেই সন্দেহ হচ্ছে। তা ছাড়া রাজনীতি রাজনীতি ক'রে তুমি প্রায়ই যে ঠাট্টা কর, রাজনীতি তো আমরা করিনে। রাজা মন্ত্রী যুদ্ধ বিগ্রহের ধার তো ধারিনে আমরা।'

সুধীর বলল, 'তবে কি কর তোমরা?'

বেলা জবাব দিল, 'আমরা সমিতির মেয়েদের অসুখ বিসুখে সেবা শুশ্রূষা করি, যারা লেখাপড়া জানেনা, তাদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করি। যাদের সংসার চলে না তাদের সেলাইর কাজ জোগাই।'

সুধীরের মনে পড়ে সে কাজে নিজেও হাত দিয়েছে বেলা। তাতেও কিছু কিছু আয় বেড়েছে সংসারের। তবু সংসার চলে না,' কথাটা কোথায় যেন গোপন কাঁটার মত বিঁধল।

একটুবাদে সুধীর বলল, 'এসব যদি কর, তাতে আপত্তি কি। কিন্তু আর যাই কর জটিল রাজনীতির মধ্যে যেয়ো না। ও জিনিষ শিশুদের জন্যেও নয়, তোমাদের মত কম লেখাপড়া জানা মেয়েদের জন্যেও নয়। অথচ আমাদের দেশের ইংরাজী বাংলায় একটা সেন্‌টেন্‌স যারা শুদ্ধ করে লিখতে জানে না, তারাই সবচেয়ে বেশি হৈ চৈ করে। যত সব দল আর উপদল এই স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের মাথা খাচ্ছে। ওদের পড়াশুনোটা আগে শেষ করতে দাও। বয়সটা আরো কিছু বাড়ুক, বুদ্ধিটা পাকুক, তারপরে যত দলাদলি করতে হয় করবে।'

বেলা বলল, 'তোমার স্কুলের ছেলেদের কথা তুমিই ভালো জানো, কিন্তু কম লেখাপড়া জানা মেয়েদের কথা যে বলছিলে সে সম্বন্ধে আমার একটু আপত্তি আছে।'

'বল'—

'দেখ, রাজনীতিটা যেমন কঠিন, তেমনি সহজও। সবাই মিলে ভালো খেতে চাই, পরতে চাই, লেখাপড়া শিখতে চাই, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চাই, এর চেয়ে সোজা কথা আর কি আছে। অথচ এই কথাগুলিই নাকি সেই কঠিন রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো। রাজনীতি ফিতি কি ছাই আমারই ভালো লাগে, না সত্যিই কিছু ওর বুঝি। কিন্তু না বুঝেও তো জো নেই, না ভেবেও তো পারিনে। চালের কাঁকর হয়ে রাজনীতি যে ভাতের হাঁড়ির মধ্যে ঢুকেছে। প্রতি গ্রাসে কির কির করে। খাওয়ার সময় টের পাও না?'

এ কথার ঠিক ঠিক জবাব হঠাৎ মুখে জোগাল না সুধীরের। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হয়ে রইল।

কিন্তু দেখতে দেখতে সেই কাঁকরওয়ালা চালও এ অঞ্চলে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল। চল্লিশ টাকা ছাড়িয়ে গেল তার মণ। টাকাতেও মেলে না এমন হোল অবস্থা। ঘরে ঘরে প্রশ্ন 'আবার কি সেই পঞ্চাশ সনের দুর্ভিক্ষ লাগল।'

চাল না মিললেও সহরের সরকারী মহল থেকে ভরসা মিলল, এই অনটন অল্প স্থায়ী। নানা দিগদেশ থেকে জাহাজ বোঝাই চাল আসছে। শিগগিরই একটা সুরাহা হবে।

কিন্তু খবরটা যত তাড়াতাড়ি এল, খোরাক তত শিগগির আসবার লক্ষণ দেখা গেল না। ঘরে ঘরে অর্ধাহার, স্বল্পাহার সুরু হোল। সহরতলীর সমাজের তলাকার বাসিন্দাদের দু'একবেলা অনাহারে চলতে লাগল।

সমস্ত অঞ্চলটা ফের চঞ্চল হয়ে উঠল। খাদ্য চাই, শস্য চাই, জন সভায় সেই দাবী উত্তাল হয়ে উঠল। দিন ঠিক হোল ভুখ মিছিল বেরোবে। মিছিল যাবে মহকুমা হাকিমের আদালতের সম্মুখে।

কিন্তু শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সঙ্গে সঙ্গে একশ চুয়াল্লিশ ধারা জারি হয়ে গেছে। সভা সমিতি শোভাযাত্রা সব নিষিদ্ধ। যার কোন দাবী থাকে, কোন কথা বলবার থাকে সে নিজে আসুক। দল বাঁধতে চাইলেই গোলমান বাঁধবে।

কিন্তু সবাই যেন গোলমাল বাঁধাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছে। পেটের আগুন কাউকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না, শান্তিরক্ষা হবে কি ক'রে?

বেলা বলল, 'দেখ আমার বড় ভয় করছে।'

সুধীর বলল, 'ভয় আমারও করছে। তুমি যে ফের কি কাণ্ড ঘটাও—'

ওপরের হুকটার দিকে একবার তাকাল সুধীর। বেলা একটু হাসল, 'দেখ এক এক সময় তাই ইচ্ছা করে। আমাদের পাড়ার বিশু

মিস্ত্রীর বউটা ছ্দিন ধরে শুকিয়ে রয়েছে। ছ্' মুঠো ওকে দিলাম তো কোথেকে খবর পেয়ে ফটিক কামারের মেয়েটা এসে আঁচল পাতলো। কিন্তু ক'জনকে দেব। একি শুধু দান খয়রাতের ব্যাপার। দান খয়রাতে কি সকলের অভাব মিটবে? না, আমি আর কিছু ভেবে ঠিক করতে পারছিনে। এক একবার মনে হচ্ছে এর চেয়ে সেবার আমার যাওয়াই ভালো ছিল। তাহলে এসব আর ছ্ চোখে দেখতে হোত না। এত জ্বালা সইতে হোত না।'

সুধীর অবশ্য, আধ মন চালের ব্যবস্থা এর মধ্যে করে এসেছে। কিন্তু বেলা যে জ্বালার কথা বলেছে তা তো শুধু তার নিজের আর ছেলে পুলেদের পেটের জ্বালা নয়, সে জ্বালা মিটায় সাধ্য কি সুধীরের।

ছ্ দিন বাদে মিছিল বেরুল রাস্তায়। সে শোভাযাত্রা সুধীরদের ঘরের সমুখ দিয়ে এগিয়ে এল।

বেলা বলল, 'তুমি একটুকাল বস, আমি দেখে আসি। আমাদের সমিতির মেয়েরাও সব বেরিয়েছে।'

সুধীর বলল, 'ওরা বেরিয়েছে বেরোক, কিন্তু তুমি কোলের এসব বাচ্চা কাচ্চা ফেলে কোথায় যাবে?'

বেলা বলল, 'বাচ্চা কাচ্চাদেরই চালের জোগাড়ে। ভয় নেই, সেবারের মত ধার চাইতে যাব না, ভিক্ষে করতে যাব না। জোর করে দাবী জানাব, জোর করে আদায় করে আনব চাল।'

সুধীর বলল, 'তারপর না পেলে সেবারেব মত হুকে ঝুলে পড়বে। তোমাকে আমি যেতে দেব না।'

বেলা বলল, 'না দিলে হুকটা আপনা থেকেই আমার গলার ওপর চেপে বসবে। আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না। একা একা ঘরে থাকলেই বরং আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। ফের কখন একটা কাণ্ড টাণ্ড ঘটিয়ে বসব। তার চেয়ে তুমি আমাকে অনুমতি দাও, আমি ওদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। বেশি দেরি হবে না। আমি যাব আর আসব।'

রাস্তা থেকে আরো ক'টি মেয়ের ডাক শোনা গেল, 'কই বেলাদি, বিদায় নেওয়া হোল তোমার ?'

তাদের কথার জবাব না দিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসেছিল বেলা। হাসলে ওকে এখনও ভারি সুন্দর দেখায়।

কে জানত সেই ওর শেষ হাসি, ও আর হাসবে না। আর ওকে হাসতে দেওয়া হবে না।

পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়েটার একটানা কান্না ভেসে আসতে লাগল, 'মার কাছে যাব, আমি মার কাছে যাব, ঠামা।'

অস্থিরভাবে চেয়ার ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়াল সুধীর, সম্ভব নয়, সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

॥ রাজপুরুষ ॥

মাথায় লাল পাগড়ী বাঁধা, গায়ে সাদা জিনের কোট, পায়ে পট্টি বেঁধে বুট পরে বেরুবার আগে স্ত্রীর সামনে সোজা হয়ে একবার দাঁড়াল শরৎ, বলল, 'যাচ্ছি।'

সুখলতা বলল, 'ও আবার কি কথার ছিরি। যাচ্ছি নয় বল আসি, সত্যি তোমাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।'

পরম আত্মপ্রসাদে শরতের শীর্ণ ঠোঁটে হাসি ফুটল। বলল, 'দেখাবে না? সরকারী চাকরি, সরকারী পোশাক, এতেও যদি সুন্দর না দেখায় তো দেখাবে কিসে।'

সুখলতা স্বীকার করে বলল, 'তা ঠিক।'

রণ্টু, মণ্টু, মিন্তি, নিন্তি চার ভাই বোন এসে ঘিরে দাঁড়াল বাপকে। বাপের এমন পোশাক তারা এজন্মে আর দেখেনি। পাগড়ীর রঙ কি লাল, কোটের রং কি সাদা, বুটের রঙ কি কালো!

সাত বছরের ছেলে রণ্টু বলল, 'বাবা আমিও লাল পাগড়ী পরব। দেবে আমাকে একটা কিনে?'

ছেলের মুর্খতায় শরৎ হেসে বলল, 'এ পাগড়ী কি কিনতে পাওয়া যায় বাবা? কিনতে পাওয়া যায় না। এ হোল সরকারী পাগড়ী। সম্মানের জিনিষ, বড় হও, লেখা পড়া শেখ, চাকরি বাকরি কর, তখন সরকার এর চেয়েও ভালো পাগড়ী তোমার মাথায় বসিয়ে দেবেন।'

পাঁচ বছরের মণ্টু বলল, 'আমাকেও দেবে তো বাবা?'

শরৎ বলল, 'দেবে বইকি। তুমিও বড় হও, লেখাপড়া শেখ—'

তিন বছরের মিন্তি বলল, 'আমাকে?'

শরৎ বলল, 'তোমাকেও দেবে।'

নিন্তি এখনো কথা বলতে শেখেনি। কিন্তু তারও চোখে ওই একই প্রশ্ন।

সুখলতা তাড়া দিয়ে বলল, 'ছেলে মেয়েদের সঙ্গে ফিরে এসে সোহাগ আলাপ কোরো। তোমার বেলা হয়ে যাচ্ছে না? সরকারী কাজে দেরি হলে ক্ষেতি হবে না?

সত্যি। ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেবল সরকারের না নিজেরও। শরৎ আর বিলম্ব না ক'রে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল।

মাথার এই রঙীন লাল পাগড়ী সহজে জোটেনি শরতের। সরকার সত্যিই আর নিজে ডেকে নিয়ে গিয়ে এ পাগড়ী সস্নেহে তার মাথায় বসিয়ে দেননি। মুরুব্বি বিষ্ণু ভটচার্য অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টা চরিত্র তদ্বির ক'রে তাকে এই পুলিসের চাকরি জুটিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুবাবু আগে স্বদেশী ক'রে জেল খেটেছেন। এখন দেশী গভর্ণমেণ্টে তাঁর অনেক সম্মান। মন্ত্রী-টন্ত্রীই হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু কেন যেন তা হতে পারেননি। তা না পারলেও দু' দু' খানা বাস চালাবার পারমিট পেয়েছেন!

মন্ত্রীত্বের চেয়ে তা নেহাৎ কম নয়, শরৎ চাকরির তদ্বিরে টালীগঞ্জে গিয়ে দেখে এসেছে তাঁর বাড়ি। হাল চাল প্রায় রাজবাড়ির মত। বউয়ের গা ভরা গয়না। কলেজে পড়া সুন্দরী মেয়েদের দেখলে চোখ জুড়োয়। তারা গয়না বেশি পরে না। কিন্তু যে চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরে, তা শরৎ বাপের জন্মেও দেখেনি। যদি টাকায় কুলোয় অবশ্য অনেকদিন বাদে দু' একটি করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে সুখলতার জন্যেও কিনে দেবে, এই রকম একখানা শাড়ি। সুখলতারও তো বয়স বেশী নয়, বাইশ তেইশই। অল্প বয়সে কতকগুলি ছেলেপুলে হওয়ায় এই রকম বুড়োটে চেহারা হয়ে গেছে। দামী শাড়ি পরলে ভালো করে সাজলে-গুজলে চেহারার ধরনটা একটু ফিরলেও ফিরতে পারে।

মুরুব্বি বিষ্ণুবাবু বলে দিয়েছেন, 'চাকরি জুটিয়ে দিলাম। আমার কিন্তু মুখ রাখিস শরৎ। অমনিতেই তো পুলিস লাইনের নানারকম বাদনাম আছে। ঘুষ-টুসের মধ্যে কিন্তু যাসনে। খবরদার খবরদার। কিন্তু ভারি কড়াকড়ি। তাহলে ধনে-প্রাণে তুইও যাবি, আমারও মান থাকবে না।'

শরৎ লজ্জায় জিবে কামড় দিল, তারপর হেঁট হয়ে বিষ্ণুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'ছি ছি ছি। আশীর্বাদ করুন বড় কর্তা, অমন কুমতি যেন আমার কোনদিন না হয়। আপনার ভিটেবাড়ির প্রজা না আমি? ছেলে বেলা থেকে দেখে আসছেন না আমাকে?

সৎ আর ধার্মিক লোক বলে সত্যিই শরতের খ্যাতি ছিল গ্রামে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর সে গ্রাম বিষ্ণুবাবুও ছেড়েছেন, শরৎও ছেড়ে এসেছে। তারপর কত অদল বদল হয়েছে। মানুষের চরিত্রও কি বদলায়নি?

বিষ্ণুবাবু চিন্তিত এবং খানিকটা যেন আত্মগতভাবেই বললেন, 'দেখে তো এসেছি, কিন্তু লোভ সামলানো বড় শক্ত, বড় শক্ত। বিশেষ করে যখন মনে হয় জীবন ভরে কেবল ছেড়েই এলাম, কিছুই নিলাম না, কিছুই পেলাম না, সারা জীবন উপবাসী রয়ে গেলাম, তখন যা পাই তাই আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। চেষ্টা করেও সামলানো যায় না।'

শরৎ ওর অনেক কথাই ঠিক মত বুঝল না, কিন্তু শেষ কথাটা বুঝতে পেরে বলল, 'আমি সামলে নেব বড় কর্তা। সব লোভ সামলে নেব দেখবেন। আপনি শুধু আশীর্বাদ করুন বড় কর্তা।

বিষ্ণুবাবু বললেন, 'আশীর্বাদ তো করিই। তোর এই সুমতি বজায় থাকুক শরৎ, চাকরিতে তোর উন্নতি হোক, কাজে কোন রকম গাফিলতি করবিনে, সময় মত আসবি যাবি। আর ওপরওয়ালাকে সব সময় মেনে চলবি, তাকে সব সময় সন্তুষ্ট রাখবি, খুশি রাখবি। উন্নতির চাবিকাঠি কিন্তু তার হাতে একথা মনে রাখিস। শুধু আমার আশীর্বাদে কিছু হবে না।'

'হবে বড় কর্তা, আপনার আশীর্বাদেই সব হবে', আর একবার বিষ্ণুবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে শরৎ বিদায় নিয়েছিল।

ট্রেনিংএর পর আমহার্ষ্ট স্ট্রীট থানায় পোষ্টেড হয়েছে শরৎ। টালায় ছোট্ট একটা বস্তীর মধ্যে বাসা। আগে এ বস্তী ছিল মুসলমানের। দাঙ্গার সময় তারা উৎখাত হয়ে গেছে। এখন কয়েক ঘর নিম্নমধ্যবিত্ত নামধারী বিত্তহীন দরিদ্র হিন্দুরা সেখানে মাথা গুজেছে। সবাই ছোট-

খাট চাকরি-বাকরি করে, বাজারে তরিতরকারি বিক্রি করে কেউ কেউ, কেউবা ধূপকাটি ফিরি করে, কেউবা চানাচুর চীনা বাদাম। কিন্তু সরকারী চাকুরে এখানে একমাত্র শরৎ দাস। তা নিয়ে সুখলতার অহংকারের সীমা নেই। মনে মনে শরৎ নিজেও বেশ খানিকটা গর্বিত। মাইনে অবশ্য বেশি নয়। মাগ্‌গী ভাতা-টাতা শুদ্ধু মাত্র ষাট। তার চেয়ে বেশি রোজগেরে পুরুষ এ বস্তীতে আছে, কিন্তু বেশি সম্মানী পুরুষ আর নেই, সকলে তাকে এখানে বেশ শ্রদ্ধা আর সমীহের চোখে দেখে। গভর্ণমেণ্টের নিন্দা-মন্দ করতে করতে শরৎকে দেখলে সবাই চট করে কথা গিলে ফেলে, কথা পালটে ফেলে, না হয় বক্তৃতা বন্ধ করে বিড়ি ধরায়। কে জানে বাবা, কোথাকার কথা কোথায় লাগাবে, শেষে দড়ি পড়বে হাতে। পুলিসের জাতকে বিশ্বাস নেই।

ওদের এই শ্রদ্ধা, ওদের এই ভয় শরতের আত্মপ্রত্যয় বাড়িয়ে দেয়। না, মাইনেটাই সংসারে সব নয়। সম্মান মর্যাদা তারও চেয়ে বড়।

গণেশ সরকার থানার হেড কনেষ্টবল। থানায় এসে শরৎ তাকে নমস্কার জানাল।

গণেশ বলল, 'হুঁ', উঠতে বসতে সেলাম তো খুব ঠুকছ। খুব বেশি ভক্তি দেখলেই মনটা যেন কেমন কেমন করে, দিনকালটা ভালো নয় কিনা, যাকগে। এনফোর্সমেণ্ট থেকে ফোন করেছিল, আমাদের এই সামনের বাজারটায় নাকি চালের কিছু কিছু ব্লাক মার্কেটিং হচ্ছে। ষ্টেপ নিতে হবে। বলাই নন্দী আর বিলাস তেওয়ারীকে পাঠিয়েছি। তুমিও যাও। দেখ গিয়ে ব্যাপারটা কি। আমি আসছি একটু বাদে।

'যে আজ্ঞে' বলে শরৎ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল।

মোড়ের পাশের দোকানটায় একটি পানওয়ালী বসে। সেখানে দুটি লাল পাগড়ী আসর জমিয়েছে। কাছে গিয়ে শরৎ দেখে পাগড়ীওয়ালারা আর কেউ নয়, তারই সহকর্মী বলাই আর রামবিলাস।

একজন সিগারেট ধরিয়েছে আর একজন খৈনী টিপছে। কিন্তু দুজনেরই চোখ আধাবয়সী পানওয়ালিটির দিকে।

শরৎ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষীরোদা তাকেও খাতির করল, 'এই যে আর একজন এসেছে। এসো খদ্দের লক্ষ্মী, এসো। কতক্ষণ তোমার পথের পানেই তাকিয়ে ছিলাম গো। পানে কি দেব গো? দোক্তা না জর্দা?'

শরৎ মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'আমার কিছু লাগবে না, আমি পান খাইনে।'

পানওয়ালী মুখ টিপে বলল, 'ওমা তাই নাকি। ও নন্দী ভৃঙ্গী মশাই, বলি কালে কালে এসব কি হোল গো। তোমাদের স্বদেশী রাজত্বে পুলিসেও পান খাওয়া ছাড়ল নাকি। কবে শুনব মাংসে বাঘের অরুচি এসেছে।'

পানওয়ালীর দেহে রূপ না থাকলেও ঠোঁটে রঙ আছে, কথায় রস, আর পানে মধু। খদ্দের জুটবার পক্ষে এদের যে কোন একটিই যথেষ্ট।

বলাই বলল, 'ওর কথা আর বোলো না। ও আমাদের ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।'

পানওয়ালী বলল, 'তাই নাকি? আর তোমরা বুঝি ভীম-অর্জুন। ওগো এবার আমার নকুল সহদেবকে এনে দাও। তাদের না দেখে প্রাণ অস্থির।'

বলে খিল খিল করে হেসে উঠল পানওয়ালী। পানের মত ওর হাসিটুকুও বেশ মিষ্টি।

শরৎ বলাইকে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ার্কি দিলেই বুঝি কাজ হবে? এসো কাজে এসো।'

বয়সে যাই হোক, শরৎ বলাইর অনেক জুনিয়র। পানওয়ালীর সামনে, রাম বিলাসের সামনে ওর কাছে ধমক খেয়ে অপমানে বলাইর চোখ মুখ রাঙা হয়ে উঠল। সে আরো জোরে পাল্টা ধমক দিয়ে বলল, 'ইয়ার্কি দিই আর যাই করি তাতে তোর কি, তোর বাবার কিরে

হারামজাদা! যা, যে কাজে যাচ্ছিস যা আমার ওপর মাতব্বরি ফলাতে এসেছেন। কত বড় সিনিয়র আমার। কত বোঝেন, কত কাজ কর্ম জানেন!'

শরৎ আর কোন কথা না বলে একটু এগিয়ে বাজারের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। সেখানে চালের চোরা-কারবারকে বাধা দিতে হবে।

পানওয়ালী আর একটা পান হাতে দিল বলাইর, বলল, 'আহা রাগ করছ কেন প্রাণের অর্জুন মাথা ঠাণ্ডা করো। যুধিষ্ঠিররা এই রকম রস-কস হীন বোকা বোকাই হয়। কি বল ভাই ভীম, তাই না?'

রামবিলাস বড় বড় গোঁফে তা দিয়ে একটু হাসল, 'ঠিক ঠিক, আচ্ছি বাৎ। তুমি ঠিক বলেছ দ্রৌপদীজী, দুনিয়ায় যুধিষ্ঠিররা বেকুফ্।'

সন্ধ্যা হয় হয়। ছোট বাজারে বেচাকেনা চলছে। শরৎ সদর্পে গিয়ে ঢুকল। এক কোণে নানা বয়সী কয়েকটি স্ত্রীলোক শাক-পাতার আড়ালে নিষিদ্ধ চাল বিক্রী করছিল, লাল পাগড়ী দেখে পুঁটলা পুঁটলি নিয়ে উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটে পালালো। থলি হাতে ভদ্রবেশি ক্রেতারাও এদিকে ওদিকে সরে পড়লেন।

পালাতে পারল না কেবল একটি মেয়ে, রোগা রোগা চেহারা। তেইশ চব্বিশ বছরই হবে বোধহয় বয়স। পরনে জীর্ণ ছেঁড়া একখানা শাড়ি। জায়গায় জায়গায় গিট দেওয়া। তেলহীন উস্কো-খুস্কো চুলের মধ্যে একটু সিঁদুরের আভাস। হাতে দুগাছি মোটা মোটা শাঁখা। একপাশে হাড্ডিসার বছর দেড়েকের একটি ছেলে। আর একপাশে ধামার মধ্যে কিছু তরি-তরকারি। আর তার নিচে চাল। এক সঙ্গে ছেলে আর ধামা নিয়ে সে পালাতে পারল না। শরৎ তাকে ধরে ফেলল, 'এই যাচ্ছ কোথায়, ব্লাক মার্কেটিং করে কোথায় পালাচ্ছ।'

ধমক খেয়ে বাচ্চা ছেলেটা ঠোঁট ফুলিয়ে কেঁদে ফেলল, 'মা ও কাঁদ কাঁদ। 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমাকে ছেড়ে দিন। আর করব না, ছেড়ে দিন।'

শরৎ ধমক দিয়ে বলল, 'ছেড়ে দেওয়ার কাজই করেছ কিনা যে

ছেড়ে দেব। কেন এই বে-আইনী কাজ করছ, কেন এসেছ চাল বিক্রি করতে।'

ফের জোরে একটা কড়া ধমক লাগাল শরৎ।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'আজ্ঞে না করলে পেট চলে না যে। বাড়িতে সোয়ামীর অসুখ। তিন মাস ধরে সে বেকার, শয্যাশায়ী। আরো দুটি ছেলে-মেয়ে আছে। তাদের রেখে এসেছি ঘরে। ছোটটা কিছুতেই থাকতে চায় না। আমাকে কেবল আঁকড়ে থাকবে। ও আমাকে জ্বালিয়ে খেল। আমার হাড়-মাংস চিবিয়ে খেল সব। এক এক দিন ভাবি তরকারির সঙ্গে ওকেও দিই বিক্রী করে, আমার সব আপদ যাক। এবার ছেড়ে দিন, দয়া করে ছেড়ে দিন।'

শরৎ একটুকাল তাকিয়ে রইল ওর মুখের দিকে। আর একখানা মুখের সঙ্গে যেন কেমন একটু একটু মিল আছে। শরৎ যখন বেকার ছিল তখন তারও যেন এই রকমই হয়েছিল চেহারা, এই রকমই হয়েছিল চোখ-মুখের দশা। এখনো যে সে দশা ফিরে গেছে তা নয়। এখনো মিল রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা যাও। আজ দিলাম ছেড়ে। কিন্তু খবরদার এরকম বে-আইনী কাজ আর কোরো না।'

'আর করব না।'

মেয়েটির মুখে এতক্ষণে একটু হাসি ফুটল। কৃতজ্ঞ চোখে শরতের দিকে একবার তাকিয়ে, ছেলে আর ধামা নিয়ে চলে গেল মেয়েটি।

বাজারের লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তারাও এবার সরে গেল।

কিন্তু তারা গেল তো এল বলাই আর রামবিলাস। পান দোক্তা খেয়ে এতক্ষণে কর্তব্যবোধ জেগেছে তাদের। বাজারে ঢুকতে ঢুকতে এও তাদের বুঝতে বাকী রইল না যে শিকার পালিয়েছে। ফাঁকে পড়েছে তারা দুজন।

বলাই এসে সামনে দাঁড়াল শরতের, 'এই ধর্মপুত্তুর ছেড়ে দিলি কেন মাগীরে। কত নিয়েছিস বার কর। ভাগ দে।'

শরৎ অবাক হয়ে বলল, 'এ তুমি কি বলছ বলাই, ভাগ আবার কিসের দেব। ভগবানের নামে দিব্যি করে বলছি, এক পয়সাও আমি নিইনি ওর কাছ থেকে।'

'অমনিই ছেড়ে দিলি?'

বলাইর কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগল সন্দেহ কুটিল।

শরৎ বলল, 'অমনি ছাড়া কি, বাড়ির অবস্থার কথা শুনে, দেহের অবস্থা দেখে মায়া হোল।'

বলাই বলল, 'হুঁ তাত হবেই, ফর্শাপানা চাঁদমুখ দেখেছ কিনা? কেবল কি মায়া কেবল কি মমতা সঙ্গে সঙ্গে কি রসের সাগরও উথলে উঠেনি। কেমন রসরাজ রসিক পুরুষ তুমি আমিও দেখে নিচ্ছি। তুমি বলাই নন্দীকে ধমকাও। ওসি-এসি ডি-সিরা বলাইকে ধমকাতে সাহস পায় না আর তুমি ধমকাও? তোমার যুধিষ্ঠিরগিরি আমি বার করছি দাঁড়াও।'

সেই দিনই বলাই আর রামবিলাস ব্যাপারটা রিপোর্ট করল ওপরওয়ালার কাছে। তিনি রেফার করলেন আরো ওপরে।

দিন কয়েক বাদে ইনস্পেক্টার শরৎকে ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে।

বিনীত ভঙ্গিতে শরৎ এসে হাত জোড় করে দাঁড়াল। মুখখানা ম্লান শান্ত, বুক খানা অস্থির।

ইনস্পেক্টার তার চেহারার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, 'তোমার নাম শরৎ দাস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'তোমার নামে এসব কি নালিস শুনতে পাচ্ছি, তুমি না-কি ব্লাক মার্কেটিংকে প্রশ্রয় দিচ্ছ, তুমি নাকি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছ এক ব্লাক-মার্কেটিয়ারকে?

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে না।'

ইনস্পেকটার ধমকে উঠলেন, 'না? তবু বলছ না। আমি যথেষ্ট খোঁজ খবর নিয়েছি তা জানো? কেবল বলাই আর রামবিলাস নয়,

বাজারের লোক পর্যন্ত তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষী আছে। তুমি ভেবেছ মিথ্যে বলে পার পেয়ে যাবে, না ?

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে মিথ্যে আমি বলিনি হুজুর। দয়া করে ঘটনাটা শুনুন।'

'আচ্ছা বল।'

শরতের মুখে ঘটনাটা সব শুনে ইনস্পেকটার বললেন, 'তাতেই বা কি, দয়া দেখাবার তুমি কে, তাকে নিয়ে আসতে এখানে। তারপর কতখানি সে দয়ার যোগ্য তা দেখা যেত। ধরা পড়লে ওরা অনেক কারসাজি করতে জানে। পরের ছেলেকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। স্বামী না থাকলেও স্বামী একজনকে বানিয়ে তোলে। ফিকির ফন্দি আট ঘাঁট ওরা যে কি জানে, আর কি না জানে তা তুমি ভাবতেও পার না, তোমাকে ওরা এক হাটে কিনতে ও আর হাটে বেচতে পারে। দয়া মায়া দেখাবার তুমি কে ? সব সময় মনে রাখবে আইন হলো ন্যায়। তার কাছে দয়া নেই, মায়া নেই, ভাই নেই, বন্ধু নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই। যত ছোট চাকরিই কর তুমি সরকারের প্রতিনিধি। যারা আইন রক্ষা করে অন্যায়কে দণ্ড দেয় তুমি তাদের প্রতিনিধি। বুঝতে পেরেছ ?'

শরৎ বলল, 'অজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইনস্পেক্টার দেয়ালের দিকে আঙ্গুল বাড়ালেন, 'জানো ওঁকে ? চেন ওঁকে ?'

দেয়ালে সুবৃহৎ একখানা ফটো, খোলা গা হাতে একখানা লাঠি।

শরৎ জোড় হাতে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে বলল, 'আজ্ঞে চিনি, মহাত্মা গান্ধী।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'হ্যাঁ মহাত্মা, মনে রেখো এ রাজ্য ওঁর। এ রাজ্য ওঁর নামে চলছে। তিনি ছিলেন সততা, সারল্য আর ন্যায়ের প্রতীক, তিনি বেঁচে থাকলে—'

'ক্রীং ক্রীং—'

ইনস্পেক্টার হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা ধরলেন। হেডকোয়ার্টারের ফোন। কি ছিল সেই ফোনের মধ্যে কে জানে। শুনতে শুনতে

ইনস্পেক্টারের মুখ গম্ভীর হোল। তিনি শরৎকে বিদায় দিয়ে বললে 'আচ্ছা যাও।'

দিন পনের বাদে শরতের ওপর হুকুম হোল তাকে ট্রাফিক পুলিস হতে হবে। এসব চোর বাটপাড় ধরার কাজ তার নয়, এর জন্যে চৌকস লোক চাই। তার চেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকজন গাড়ি ঘোড়ার চলা-ফেরা নিয়ন্ত্রণ করুক শরৎ। মোড়ে বসে বসে পাহারা দিক, তাতে হাংগামা হুজ্জৎ অনেক কম।

শরৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'আজ্ঞে কোন দোষে আমাকে এমন ক'রে নামিয়ে দেওয়া হোল।'

ইনস্পেক্টার বললেন, 'এতে ওঠা নামার কি আছে। যে কাজ তুমি পারবে, তোমাকে সেই কাজ দেওয়া হচ্ছে। তোমার মাইনে তো ঠিকই থাকল।

শরৎ বলল, 'আজ্ঞে মাইনেই তো সব নয়; সম্মান—।' ইনস্পেক্টার একটু হাসলেন, 'ও সম্মান। তা সম্মান তোমার ও কাজেও নেহাৎ কম হবে না। যেখানে যে সার্ভিসই তুমি দাও না কেন, দেশের কাজ করছ একথা মনে রাখবে। তুমি কেউকেটা নও। তুমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি।

বলে নিজের মনেই একটু হাসলেন ইনস্পেক্টার।

শরৎ বলল, 'তবু আমার দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন বড়বাবু। আমাকে অফিসে ফিরিয়ে আনবেন। ফের চোর ধরবার কাজ দেবেন আমাকে। এবার আর আমার কোন গাফিলতি হবে না, দয়া মায়ায় দুর্বল হব না আমি।

ইনস্পেক্টার বললেন, 'আচ্ছা। চোর ধরবার দায়িত্ব তোমার এখনও আছে। তা কেড়ে নিচ্ছে কে। চোর তো তোমার শুধু ওই ছোট বাজারটুকুর মধ্যে নেই, এই ভবের বাজারই যে চোর বদমাসে ভরা। চোর তোমার বাড়ির মধ্যে, তাদের ধরো, তাদের সায়েস্তা করো শরৎ।'

সদুপদেশে স্ফীত হলো শরৎ, নত হয়ে ইনস্পেক্টারকে প্রণাম

জানিয়ে বিদায় নিল।

ট্রেনিং-এর পরও কোন বড় রাস্তার ভার পেল না শরৎ, ছোট রাস্তার মোড়ে দাঁড়াল চৌকিদার হয়ে।

বলাই একদিন যেতে যেতে বলল, 'কি ধর্মপুত্তুর, তোমার ধর্মরাজ্য কেমন চলছে আজকাল ?

শরৎ কোন জবাব দিল না।

কিন্তু বস্তীর কানাই শীল আর জগৎ সরকারেরও একদিন চোখে পড়ে গেল, 'আরে তুমি যে এখানে !'

শরৎ বলল, 'হ্যাঁ এখানে ট্রান্‌সফার হয়েছি।'

কানাই বলল,' 'বেশ বেশ। বদলির জায়গাটি ভাল।'

জগৎ কিছু বলল না। শুধু মুখ টিপে হাসল।

সেইদিনই সমস্ত বস্তীটার মধ্যে রটে গেল চাকরিতে শরতের অবনতি হয়েছে।

সুখলতা স্বামীকে আড়ালে নিয়ে গেল। যাতে ছেলে পুলেদের কানে না যায় তার জন্যে ফিস ফিস করে বলল, 'হ্যাঁ গো, এসব কি শুনছি। তোমাকে নাকি নামিয়ে দিয়েছে।'

শরৎ বলল, 'কে বলল ?'

সুখলতা বলল, 'সবাই বলছে। কেবল তুমিই এতদিন বলনি আমার কাছে গোপন করে গেছ। হ্যাঁ গো কেন গোপন করলে। কেন লজ্জা করলে। আমি কি কেবল তোমার মান সম্মানের ভাগী, দুঃখ অপমানেরও সমান ভাগী নই ? আমার কাছে খুলে বল সব শুনি।'

সবই খুলে বলল শরৎ। বলল এতে মান অপমানের কিছুই নেই, ওঠা নামারও কিছু নেই, এ কেবল এক বিভাগ থেকে আর এক বিভাগে বদলী, সব কাজই দেশের কাজ, সব কাজই স্বদেশী সরকারের কাজ।

সুখলতা একটু হাসল, 'তবু তুমি গোপন করছ, তবু তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না। আচ্ছা গোড়ার ব্যাপারটা কি বল দেখি, গোড়ার দোষটা কার।'

শরৎ বলল, 'দোষটা তোর, দোষটা তোর ওই মুখের আদলের। তোর জন্যেই তো এই সর্বনাশটা হোল।'

'হেঁয়ালী রেখে সোজা কথায় বল না গো ব্যাপারটা কি।'

শরৎ তখন সোজা ভাষায় বাজারের ঘটনাটা বর্ণনা করল। শেষে বলল সেই চোর মেয়েটার মুখে সুখলতার আদল দেখতে পেয়েই এই গোলমালটা ঘটেছে। সুখলতা হেসে বলল, 'সর্বনাশ, রাজ্যশুদ্ধ বউ-ঝির মুখে তুমি যদি আমার মুখের আদল দেখে বেড়াও তাহলেই গেছি আর কি। বাইরে একপাল সতীন নিয়ে আমি ঘরে তাহলে স্থির হয়ে কি করে থাকব গো। আমি তো তোমাকে এর পর থেকে আর বাইরে যেতে দেব না।'

শরৎও বলল, 'বেশ তো।'

সুখলতা বলল, 'আর কি তোমার পছন্দ! সেই গরীব দুঃখী চোর মাগীর মুখটা হবে কেন আমার মুখের মত। কোন রাজরানীর মুখের সংগে বুঝি আমার মিল থাকতে পারে না?'

শরৎ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। রোগা, চোয়ালের হাড় লাগা মুখ। নাকটা থ্যাবড়া, ঠোঁট পুরু, চোখ দুটো ছোট ছোট। তবু এ মুখ রাজরানীরই। শরৎ স্বীকার ক'রে বলল, 'পারে।'

ছেলে মেয়েরা এসে পড়ায় দাম্পত্যালাপ বন্ধ রাখতে হোল তখন-কার মত।

বস্তীর লোকেরা একটু তাচ্ছিল্য করলেও শরৎ টলল না। কর্তব্যে অটল থাকবে সে। শরৎ যত ছোটই হোক যত ছোট চাকরিই করুক সে রাজ সরকারের প্রতিনিধি। ন্যায়ধর্মের প্রতীক। তার চোখের সামনে কোন অন্যায়কে সে সহ্য করবে না, কোন চুরি জোচ্চুরি বদমায়সি, দুর্নীতিকে বরদাস্ত করবে না। সে বাড়িকে পবিত্র রাখবে, ঘরকে পবিত্র রাখবে, নিজেকে পবিত্র রাখবে। মহাত্মার আদর্শে গড়ে তুলবে এই মহাভারতকে।

সারা বস্তীটার মধ্যে শরৎ চৌকি দিয়ে বেড়াতে লাগল। কোথায় চোর, কোথায় বদমাস, কোথায় কালো-বাজার।

ইনস্পেক্টার ঠিকই বলেছেন। ঘরে ঘরেই তারা, ঘরে ঘরে ক্লেদ, ঘরে ঘরে ক্লিন্নতা।

বস্তীর সামনে ছোট একটা মিষ্টির দোকান আছে হরিপদ সা'র। খোঁজ নিয়ে দেখল সব মিষ্টিতে ভেজাল। ঘির নামে যা তা তেল দিয়ে ভাজে। টাটকা বলে তিনদিনের বাসি মাছি পড়া খাবারগুলি বিক্রি করে।

শরৎ বলল, 'এসব চলবে না সা মশাই।'

হরিপদ বলল, 'এতকাল চলে এল আর আজ চলবে না? এইগুলিই এখানে ভালো চলে। এর চেয়ে ভালো মাল অচল।'

শরৎ বলল, 'না চলবে না। এতকাল চললেও আর চলবে না, আমি এসব চালাতে দেব না।'

হরিপদ এবার বিরক্ত হোল, 'আচ্ছা না দাও না দেবে। তাই বলে যা ভেবেছ তা হবে না। একটি পাই পয়সাও তোমাকে আমি দেব না। এটা তোমার এলাকাও নয়, এক্তিয়ারও নয়। যাদের দেবার তাদের দিয়েছি। বলে হাতী ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল। উনি এসেছেন খবরদারী করতে। ভেজাল কোথায় নেই শুনি, তোমরা নিজেরা কি, তোমরা নিজেরাও তো আগা গোড়া এই ভেজাল ঘিয়ে ভাজা। নিজেদের কর্তাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলো।'

শরৎ ধমক দিল, 'যা তা বলো না, সরকারের নিন্দা কোরো না, এ সরকার কংগ্রেসের আর কংগ্রেস ছিল মহাত্মা গান্ধীর। তাঁর নাম শুনেছ?' হরিপদ বলল, 'খুব শুনেছি। এখন ওই নামটুকুইতো শোনাচ্ছ তোমরা সেই নামাবলীখানাই গায়ে জড়িয়ে রেখেছ। আর কি রাখতে পেরেছ তা ছাড়া? ধরতে হয় আগে বড় বড় রাঘব বোয়ালকে ধরো। আমাদের মত চুনোপুঁটিকে মেরে লাভ কি।'

শরৎ বলল, 'চুনো পুঁটিরাই পরে বড় হয়ে রাঘব বোয়াল হয় সা মশাই।'

সেদিনকার মত চলে এল শরৎ। কিন্তু ভাবনা ধরল মনে। রাঘব বোয়ালদের কি করে ধরবে। সে সাধ্য তার নাই। এই ক'মাস ধরে কান খোলা রেখে অনেক সে শুনতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে বুঝে দেখতে। পড়ছে এদলের সেদলের খবরের কাগজ। সব বুঝতে

পারেনি। বোঝা শক্ত। সব তো চোখের সামনে হয় না। চোখের আড়ালে আড়ালে কাজ চলে। হৃদয় দিয়ে ছোঁয়া যায় না, বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না, বড়ই জটিল এই সংসারের কাণ্ডকারখানা। কিন্তু এটা মাঝে মাঝে টের পাওয়া যায় রাঘব বোয়ালেরা আছে। জলের তলে তাদের রাজত্ব। তারাই নাড়ছে কলকাঠি। তাদের ধরবে কে ?

মাথা গুলিয়ে যায় শরতের, বুদ্ধি গুলিয়ে যায়। ভেবে যেন আর কুল কিনারা পায় না। বার বার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মহাত্মার মূর্তি। কোথায় তাঁর রাজ্য, কোথায় তাঁর মাহাত্ম্য ? এ দুনিয়ায় শুধু কি তাঁর নামটুকু থাকবে আর কিছু থাকবে না ?

একদিন সুখলতা বলল, 'অত কি ভাবছ ? সদাই আনমনা, এত ভাববার কি আছে ?'

শরৎ পরম বিজ্ঞের মত একটু হাসল, 'ভাববার নেই ? তুমি কিচ্ছু টের পাচ্ছ না সুখো, কিছু বুঝতে পারছ না। যদি পেতে তাহলে ও কথা বলতে না।'

সুখলতা বলল, 'আচ্ছা, তোমার সরকারী ভাবনার কথা না হয় নাই বুঝলুম। কিন্তু ঘরে যে ছেলেটা জ্বরে জ্বরে সারা হয়ে গেল, সেদিকে তোমার চোখ পড়বে না ?'

শরৎ বলল, 'পড়বে না কেন। পরশু না গিয়েছিলে ওঘরের যতীনকে নিয়ে হাসপাতালে ? কি হোল ?'

শরতের সময় হয় না বলে অন্য ঘরের একটি ছেলেকে সাধ্য সাধনা ক'রে সুখলতা রোগা ছেলেটাকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিল। অল্প কয়েকজন ডাক্তার, অনেক রোগী। সবাইকে ভালো করে দেখবার তাদের সময় নেই, সময় নেই রোগের বিবরণ ধৈর্য ধরে শুনবার। তারা শুধু একবার তাকায় আর ওষুধের নাম লেখে। যে সব রোগা ছেলের মা দেখতে ভালো দামী দামী শাড়ি গয়না পরা তাদেরই বেশি যত্ন করে। হাসপাতাল গরীবদের জন্যে নয়, হাসপাতাল বড় লোকদের জন্যে।

সুখলতা সব বর্ণনা করে শেষে বলল, 'ও সব সরকারী হাসপাতালের

বিনা পয়সার ওষুধে কিছু হবে না। ছেলেকে যদি বাঁচাতে হয়, পয়সা খরচ করে ভালো ডাক্তার দেখাও।'

বড় জ্বালা সুখলতার গলায়।

শরৎ একটুকাল চুপ করে রইল। সকলের মুখে একই কথা। অসাধুতা অব্যবস্থার বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। দেখে শুনে ঘাবড়ে যায় শরৎ। বুদ্ধিতে যেন কিছু বেড় পাওয়া যায় না।

সুখলতা বলল, 'কি কথাটা কানে গেল আমার, না গেল না?

শরৎ বলল, 'গেছে গেছে। মাসের এই ক'টা দিন যাক। মাইনে পাই তারপর দেখাব ডাক্তার। এখন টাকা কোথায় পাব। চুরি করতে যাব না কি?'

সুখলতা বলল, 'তুমি যাবে কেন আমি যেতে পারব।'

স্ত্রীর সঙ্গে আর ঝগড়া না করে শরৎ বেরিয়ে পড়ল। না ঘাবড়ে যাওয়াটা কোন কাজের কথা নয়। তার যতটুকু সাধ্য সে করবে। বড় বড় রাঘব বোয়ালদের ধরা যদি তার শক্তিতে না কুলোয় চুনোপুটিকেও সে ছেড়ে দেবে না। ছোট সাপও সাপ। ছোট অন্যায়ও অন্যায়। প্রাণ দিয়ে সেই অন্যায়কে সে রোধ করবে। আর কিছু না পারুক নিজের আফিসখানা পরিষ্কার রাখবে, ঘর খানাকে রাখবে পবিত্র নির্মল করে। তিনি যদি বেঁচে থাকতেন এখানে পা রাখতে কোন সঙ্কোচ করতেন না। একথা যেন সগর্বে সবাইকে বলতে পারে শরৎ।

দিন দুই বাদে শরৎ কাজে বেরুচ্ছে হঠাৎ দেখল উত্তর-পূব কোণের ঘরের হরকান্ত রাহার মেয়ে মঙ্গলা এক পাঁজা রেশন কার্ড হাতে রেশনের দোকানে যাচ্ছে।

শরৎ থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'অতগুলি কার্ড কাদের রে?' তের চৌদ্দ বছর হয়েছে মঙ্গলার বয়স। বাড়ন্ত গড়ন। তবু শাড়ির অভাবে এখনো ওকে ফ্রক পরে থাকতে হয়। খুব চালাক মেয়ে মঙ্গলা চোখে মুখে কথা বলে।

মঙ্গলা কার্ডগুলি আড়াল করে বলল, 'কাদের আবার, সব আমাদের।'

শরৎ বলল, 'কিন্তু লোক তো তোরা মাত্র চারজন। অতগুলি কার্ড এল কি করে। নিশ্চয়ই জাল কার্ড সব, দেখি।

বলে এগিয়ে গেল শরৎ।

সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলা চীৎকার করে উঠল, 'বাবা, দেখ এসে। আমাদের সব কার্ড কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

হরকান্ত বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কে রে কে কেড়ে নিচ্ছে কার্ড?'

মঙ্গলাকে কিছু বলতে হল না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে পারল হরকান্ত। ধমক দিয়ে বলল, 'আমার অত বড় বয়স্থা মেয়ের সঙ্গে হাতাহাতি করতে যাচ্ছ, তোমার লজ্জা করে না শরৎ? সরে এসো, এসো বলছি।'

শরৎ দু' পা পিছিয়ে এসে বলল, 'কিন্তু কার্ডগুলি জাল কিনা আমি দেখব।'

হরকান্ত গর্জে উঠল, 'কক্ষনো না, কক্ষনো না, তোমাকে আমি কার্ড দেখতে দেব না। তোমার কোন রাইট নেই আমাদের কার্ড দেখবার। যা করবার রেশনের আফিসে করবে, রেশনের দোকানে করবে তুমি কে, তোমার মত অমন ঢের পুলিস দেখেছি আমরা।'

ততক্ষণে আরো দু' চারখানা ঘরের লোক উঠানে নেমে এসেছে। একজন মন্তব্য করল 'দুবেলা দু'মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করতে পারে না কেবল জাল আর জাল। লোকে কি না খেয়ে মরবে? ভাত কাপড়ের কেউ নয়, কিলোবার গোঁসাই।'

ফটিক পোদ্দার বলল, 'আর বলো না। লোকটাকে নিয়ে যা জ্বালা হয়েছে। প্রত্যেকের পিছনে উনি খোঁচা দিয়ে দিয়ে বেড়াবেন। আর বাঘের ঘরে যে ঘোঘে বাসা বেঁধেছে, সেখানে যে পুরোদমে ব্লাক মার্কেটিং চলেছে সে বেলায় দুটি চোখ যেন বোঁজা।'

শরৎও গর্জে উঠল এবার, 'কি কি বললে। আমার ঘরে ব্লাক মার্কেটিং কক্ষনো না, কক্ষনো না। সব মিথ্যে কথা।'

ফটিক বলল, 'মিথ্যে না সত্যি জিজ্ঞেস করো হরি সাঁকে। তোমার

বউ কালও তার কাছে পাঁচ সিকে করে ছ' সের চিনি বিক্রি করেছে। উনি আবার সাধুগিরি ফলাতে আসছেন এখানে।'

শরৎ এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'সা মশাই সত্যি?'

হরিপদ ফোকলা দাঁতে হেসে বলল, 'যাকগে, যেতে দাও, যেতে দাও। যা বাজার পড়েছে তাতে কালো বাজারে সবাইকেই নেমে আসতে হবে, বাকি থাকবে কে?'

কিন্তু শরৎ হরি সা'র উপদেশ শোনার জন্য অপেক্ষা করল না! এক লাফে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকল। গোলমাল শুনে সুখলতাও দোরের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবার সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। ততক্ষণে শরৎ এসে তার সামনে দাঁড়িয়েছে।

'এসব কি শুনছি, তুই না কি ব্লাক মার্কেটের দরে চিনি বিক্রি করেছিস?'

সুখলতা বুঝিয়ে বলতে গেল, 'আগে শোনই কথাটা।'

শরৎ বলল, 'শুনব আবার কি হ্যাঁ কি, না তাই বল।'

সুখলতারও রাগ হোল এবার, বেশ জেদের সঙ্গে বলল, 'হ্যাঁ করেছি। ছেলেটা বিনা চিকিৎসায় মরে যাচ্ছে বলে করেছি। ওই টাকা দিয়ে আমি ডাক্তার আনব। একটু একটু করে ওই চিনি আমি ছ মাস ধরে জমিয়েছি। ভেবে ছিলাম ওদের রস-বড়া করে খাওয়াব। তা ভগবান করতে দিলেন না, এখন ওষুধ খেয়ে তো বাঁচুক। ভালো ডাক্তার এসে তো একবার দেখে যাক।'

কিন্তু কোন কথা শরতের কানে গেল না। ও শুধু খানিকক্ষণ নিষ্পলক হয়ে দেখল তার স্ত্রীর মুখে সেই ছলনাময়ী চোর মেয়েটার মুখ, যাকে দয়া করতে গিয়ে চাকরিতে অবনতি হয়েছে শরতের, অপমান হয়েছে সকলের কাছে।

হঠাৎ ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক চড় বসিয়ে দিল শরৎ স্ত্রীর গালে, 'হারামজাদী, আমার ছেলে বিনা চিকিৎসায় মরে তো মরুক। তাতে তোর কি, তোর বাবার কিরে হারামজাদী, তুই কেন ব্লাক মার্কেটিং করতে গেলি?' চড়ের পর চড় পড়তে লাগল সুখলতার

গালে। ন্যায়ের কাছে স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ঠিক বলেছেন ইনস্পেক্টার।

সুখলতার শরীর ভালো যাচ্ছিল না। আগের দিন সাবিত্রী ব্রতের উপোস গেছে। বেশিক্ষণ আর সহ্য করতে পারল না। মাথা ঘুরে পড়ে গেল মাটিতে। পড়েই জ্ঞান হারাল।

রোগা ছেলেটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার মাকে মেরে ফেলল।'

উঠান থেকে পাঁচ সাতজন পুরুষ এসে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলল শরৎকে। মেয়েরা সুখলতার পরিচর্যা শুরু করল। তাদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবীণা বৃদ্ধা পিসী বলল, 'আহাহা বউটাকে খুন করে ফেলেছে গো, খুন করে ফেলেছে। ও আবার পুলিস। ও আবার সরকারী চাকরি করে। ওকে তোমরা জেলে দাও, শিগগির জেলে দাও।'

হরকান্ত ঘাড় ধরে শরৎকে ঘর থেকে বার করতে করতে বলল, 'তাই দেওয়া উচিৎ। তোকে জেলেই দেওয়া উচিৎ। তোর বড় বাড় বেড়েছে হারামজাদা।' আরো কয়েকটা কিল ঘুসি পড়ল শরতের বুকে পিঠে।

লাল পাগড়ী খুলে গিয়ে উঠানের ধূলোয় পড়ল। নোংরা ময়লা হয়ে গেল সাদা কোট। বুট-জুতো কোথায় ছিটকে পড়েছে তার আর ঠিক নেই।

কিন্তু সে-সব দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করল না শরৎ। সম্বিৎহারা স্ত্রীর দিকে এতক্ষণে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ধরা গলায় বলল, 'তাই দাও। তোমরা জেলেই দাও আমাকে। সরকারী চাকুরির আমি যোগ্য নই, সরকারী গারদই আমার ঠিক জায়গা।'

॥ একূল ওকূল ॥

স্বজন বন্ধুদের নিন্দা তিরস্কারে কান পাতবার জো রইলনা। পরিচিত অর্ধপরিচিতের দল ব্যঙ্গ বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠল। এমন কি স্বামী পর্যন্ত যেন আড়ালে আড়ালে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু আমি রইলাম স্থির। আচারে আচরণে কিছু মাত্র জড়তা নেই, কুণ্ঠা ভয়ের লেশ নেই এতটুকু। নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্ময় বোধ করলাম। সতিই কি এতখানি জোর ছিল আমার মনে, ভিতরে ছিল এতখানি জেদ! সবাই বলাবলি করল, 'ধন্য মেয়ে। রক্ত মাংসে গড়া হলে মায়া মমতা, দয়া দাক্ষিণ্য থাকত, কিন্তু এর সবখানি একেবারে পাথরে তৈরী।'

মনে মনে হাসলাম। একথা কি সবাই নতুন করে জানল? আমার দেহেও যে রক্ত মাংস আছে কারো কারো ব্যবহারেই কি এর আগে তার কোন পরিচয় মিলেছিল?

তেইশ বছর আইবুড়ো থেকে আমি যাঁকে পতিত্বে গ্রহণ করেছি তাঁর পুত্রবতী প্রথমা স্ত্রী রয়েছেন দেশে। আধুনিক কালে এমন অনাচার শিক্ষিত সমাজে অচল। তাই এই আলোড়ন আন্দোলন, কটূক্তি অভিশাপের পালা।

স্বামীর পিতৃকুল আর প্রথম পক্ষের শ্বশুরকুলের হিতৈষীরা শাসিয়ে গেছেন। এ বিয়ের সমর্থনে না আছে আইন না আছে ধর্ম। বৈদ্য ব্রাহ্মণের বিয়ে হিন্দুমতে হয় না। সিভিল ম্যারেজে যুগপৎ দুই স্ত্রী গ্রহণের নজীর নেই। সুতরাং প্রতিফল মিলবে হাতে হাতে। কেউ কেউ অনুনয় বিনয়ও করেছেন। আমি শিক্ষিতা মেয়ে। আমার ভাবনা কি? মনের মানুষ ইচ্ছা করলে এখন আমার অনেক জুটবে। কিন্তু অবলা সরলা পল্লীবাসিনীর কথাটা যেন দয়া ক'রে আমি ভেবে দেখি। পতিছাড়া তার গতি নেই।

বান্ধবীরাও হাসাহাসি করেছে, 'ছি ছি, শেষ পর্যন্ত দোজবরে বর আর সতীনের ঘর। একি জঘন্য প্রবৃত্তি তোর।'

জবাব দিয়েছি, 'আয়, দেখ এসে আমার ঘর। সেখানে সতীনের চিহ্নটুকুও নেই, আমিই একেশ্বরী, হৃদয়েশ্বরী বরের।'

তারা প্রতিবাদ করেছে, 'কারো হৃদয়েশ্বরী কিনা তার প্রমাণ পরে মিলবে, নিজের কিন্তু তোর হৃদয় বলে কিছু নেই।'

হেসে বলেছি, 'না ভাই, খানিকটা আছে। কিন্তু সেটুকু নিতান্তই কোন পুরুষকে বিলিয়ে দেওয়ার জন্য। সেই তার পুরুষার্থ। বিশ্বাস না হয় নিজেদের হৃদয়কে জিজ্ঞেস ক'রে দেখ খাঁটি জবাব পাবি।'

মা নেই। বাবা আসেন নি। মুখ দেখতে আর মুখ দেখাতে লজ্জা পাবেন বলে।

তাঁর পক্ষ থেকে ভগ্নীপতি এসেছিলেন গম্ভীর মুখে। গুরুজনের ভঙ্গিতে বিষয়টির গুরুতর বিষময় ফল জানিয়ে গেছেন, 'এর পরেও আত্মীয়তা কুটুম্বিতা হয়তো আর স্বীকার করা চলবে না। যাতায়াত পর্যন্ত বন্ধ করতে হবে।'

বলেছি, 'অতখানি হতাশ হচ্ছেন কেন? আমার দোর কিন্তু খোলাই থাকবে। আর বিয়ে হয়েছে বলে সর্বদাই যে দোরগোড়ায় পাহারা থাকবে তা মনে করবেন না।'

তিনি মুখ লাল ক'রে ফিরে গেছেন। তাঁর রক্তিম হওয়ায় অবশ্য কারণ ছিল।

বিষয়টিকে আগাগোড়া যতবার তন্ন তন্ন করে ভেবে দেখেছি অনুশোচনা করবার হেতু পাচ্ছিনা। কেন করব? অপরাধটা কার? বিত্তহীন মা বাপের ঘরে শ্রীহীন মেয়ে জন্মেছি কিন্তু তার জন্য কি আমি দায়ী? জ্ঞান হওয়া মাত্র দেখে এসেছি মা আমার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন বাবা তাকিয়ে রয়েছেন হিংস্র চোখে। যেন টুঁটি টিপে মেরে ফেলতে পারলে বাঁচেন। কখনো বা অদ্ভুত ভঙ্গিতে আদর করে হেসে উঠেছেন, 'মার আমার একেবার গা ভরা রূপ, ওজনদরে রূপা দিতে গেলে যে ভিটেমাটিতেও কুলোবেনা।'

ছুটে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে পারিনি, পরক্ষণেই তিনি কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলেছেন, 'বাপরে বাপ, রাগ দেখ মেয়ের, পাগলী কোথাকার। আমি ঠাট্টা করছিলাম। ভিটেমাটি বেচতে হবে কেন? আমি তোকে পড়াব, বি-এ, এম-এ পাশ করিয়ে ছেলের মত মানুষ করে তুলব, বিয়ের দরকার নেই তোর।'

কথা রাখতে বাবা সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন। আমার সম্বন্ধে বিবেচনা তাঁর ছিলনা এমন মিথ্যা কথা বলব না। বড় দিদি পাঠশালা পেরোন নি, মেজদিদি হাইস্কুলের তিনচার ক্লাস পর্যন্ত পড়েই পাত্রস্থা হতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমি যে মফঃস্বল সহরের হাইস্কুল ডিঙ্গিয়ে একেবারে কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হওয়ার অনুমতি পেলাম তা কেবল আমার বিয়ের কোন সম্ভাবনা নেই বলেই। বাবা সেদিকে বৃথা কোন চেষ্টাও করেন নি। কেননা ইতিপূর্বে দুই মেয়ের বিয়েতে তাঁর চুল আর বুদ্ধি দুইই পক্কতা লাভ করেছিল। তাই রূপের একান্ত অভাব বিদ্যায় যদি কিছুটা ঘোচে, বিয়ের বাজারে নিতান্তই একটু যদি কারো চোখে পড়ি সেই দুরাশায় দুরুদুরু বুকে এসে ঢুকলাম কলেজে। বাবার সুপারিশে মাসতুতো ভাইয়ের চাকরি হয়েছিল। সেই দাবীতে তাঁর বাসায় বাসাহার জুটল। তার বছর তিনেক বাদে জুটলেন নীরদবাবু, ননীদার অফিসের বন্ধু।

ননীদা বলতেন বন্ধুত্ব তাঁদের অফিসেই হয়েছে বটে কিন্তু এমন গাঢ়তা ছেলে বেলার বন্ধুত্বেও থাকেনা। অনেক গুণ আছে ননীদার বন্ধুর, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রী আছে, অফিসের কর্তৃপক্ষের কাছে আছে আদর। কিন্তু গুণ তো কিছু না কিছু প্রত্যেক পুরুষেরই থাকে, ননীদার বন্ধুর তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু আছে। সে তাঁর রূপ যা প্রায় পুরুষেরই থাকেনা। দর্শকদের বেশির ভাগই পুরুষ। তাই নিজেদের রূপের অভাব তাঁদের চোখ এড়িয়ে যায়, নিজের জাতের দিকে তাদের চোখ পড়েনা, কিন্তু যদি একবার পড়বার মত করে পড়ে তখন আবার সেই চোখে পলক পড়তে চায়না। পুরুষের রূপ মেয়েদের চেয়েও তীব্র, তার আকর্ষণ মেয়েদের চেয়েও বেশি. কেননা

সে রূপ তাদের স্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। কবিতায় আর ছবিতে মেয়েরা যদি সামান্যও সংখ্যাগুরু হোত তাহলে কলম আর তুলির মুখে কেবল পুরুষের রূপই দেখা যেত। এ ধরণের মন্তব্যে ননীদা প্রায়ই মুখর হয়ে থাকতেন।

রেবা বউদি বিরক্তির ভঙ্গিতে বলতেন, 'থামো, থামো,তবু যদি নিজের রূপ একটু থাকত। বন্ধুর রূপের কথা উঠলে আর কারো কথা বলবার জো নেই, কিন্তু আমার তো মনে হয় সব তোমার চাল, অন্য সব কিছুর মত তোমার বন্ধু নীরদবাবুর রূপও কেবল তোমার কথা-সর্বস্ব। না হলে সাহস করে একদিন তাঁকে নিয়ে আসতে। কিন্তু ভয় আছে পাছে ধরা পড়ো।'

ননীদা জবাব দিতেন, 'ভয়ই বটে, কিন্তু সেটা ধরা পড়বার নয়, পাছে সর্বস্ব ধরে দিতে হয় সেই ভয়।'

বউদি আরক্ত মুখে বলতেন, 'আহাহা, ভঙ্গি দেখ কথার। অতই সোজা ভেবেছ বুঝি।'

বইয়ের আড়ালে চেয়ে চেয়ে দেখতাম ননীদা মৃদু হাস্যে কৌতুকের চোখে স্ত্রীর মুখের অপরূপ লজ্জা উপভোগ করছেন। আমি আবার বইয়ের আড়ালে মুখ ঢাকতাম। রাতদিন এই রূপ রসের আলোচনা আমার সহ্য হ'তে চাইতনা, অপমান কর বলে মনে হোত। কিন্তু তবু সেখান থেকে উঠে যেতে পারতাম না। কান জ্বলে যেত। তবু উৎকর্ণ হয়ে থাকতাম তাঁদের কথা শোনার জন্য।

ননীদা বলতেন এত রূপ গুণ থাকা সত্বেও তাঁর বন্ধুর একটা মারাত্মক দোষ আছে। তিনি নাকি বড় লাজুক আর বড় ভালো মানুষ। মোটেই এযুগের ছেলেদের মত নয়। মেয়েদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারেন না। আর সেই ভয়েই তিনি আসেন না এখানে। সুতরাং ভয়টা ননীদার নয়, নিতান্তই তাঁর বন্ধুর। পৃথিবীতে একটি মাত্র মেয়েকে তিনি চেনেন। চিনতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'বিয়েও করেছেন না কি?'

ননীদা একটু যেন চমকে উঠেছিলেন, তারপর হেসে বলেছিলেন, "হ্যাঁ, প্রায় বাল্যকালেই সে পাট একেবারে সেরে রেখেছে। পাড়াগাঁয়ের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার। চাল চলনই আলাদা। স্ত্রীটি কিন্তু বেশ সুন্দরী। সেই জন্যই বাপের কাছে বোধ হয় এত খানি কৃতজ্ঞ আছে নীরদ।'

বউদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তুমি তাঁর স্ত্রীকে দেখেছ নাকি?'

ননীদা বলেছিলেন 'না, ফটো দেখেছি নীরদের কাছে। তার নিজের হাতের ছবিও দেখেছি। নীরদ আবার এক আধটু ছবিও আঁকতে পারে কিনা।'

বউদি বললেন, 'আর বসে বসে নিজের বউয়ের ছবিই বুঝি কেবল আঁকেন?'

ননীদা জবাব দিলেন, 'কি আর করবে। পরের বউয়ের ছবি আঁকবার সাহস ক'জনের থাকে? সুযোগই বা কজনে পায়?'

তারপর আমি উঠে গিয়েছিলাম। নীরদবাবু সম্বন্ধে কোন কৌতূহল, কোন ঔৎসুক্যই যেন তারপর আমার আর অবশিষ্ট ছিলনা।

কিন্তু ননীদার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যিই নীরদবাবু একদিন এলেন। ননীদা বললেন, 'নীরদের লজ্জার বাঁধ এতদিনে ভেঙেছে। প্রায় মানুষ করে এনেছি, এবার ভালোমানুষিতা খানিকটা ভাঙতে পারলেই হয়।'

নীরদবাবু জবাব দিলেন না কিংবা দিতে পারলেন না। নিঃশব্দে কেবল একটু হাসলেন, অমন সুন্দর করে যিনি হাসতে জানেন সব কথায় জবাব তাঁর না দিলেও চলে।

বললাম, 'ননীদার ধারণা ভালো মানুষেরা পুরো মানুষ নন।'

নীরদ বাবু হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার ধারণাও কি তাই?'

চমকে উঠলাম, কথার মধ্যে কেমন যেন একটু বেদনার সুর বাজল, না কি তাঁর বলবার ভঙ্গিই এই রকম। মাধুর্যের সঙ্গে বেদনার কি কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে?

জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বললাম, 'আমার ধারণার কথা তো বলিনি, আমি কেবল ননীদার ধারণার ভাষ্য করছি।'

ননীদা বললেন, 'কিছু মনে কোরোনা নীরদ, শ্রীমতী মীরার ধরণই এই। মূল গ্রন্থের ধার ধারেনা, কেবল টীকা টীপ্পনী নিয়েই কারবার।' নীরদ বাবু ননীদার দিকে তাকিয়েই জবাব দিলেন, 'আমি কিন্তু তা মনে করিনি।' নীরদ বাবুর কথা শুনে মনে মনে খুসি হলাম আর কুপিত হলাম ননীদার ওপর। নীরদ বাবুর সামনে আমাকে তিনি অত তুচ্ছ করবার চেষ্টা না করে কি পারতেন না?

ননীদা যেন আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন। মুচকি হেসে একবার আমার দিকে তাকিয়ে নীরদ বাবুর দিকে চেয়ে বললেন, 'আচ্ছা তা হলে আশায় থাকো। কেবল ভাষ্য নয় মীরার নিজের ধারণার ভাষাও একদিন না হয় শুনবে।'

কিন্তু আমার ধারণার কথা ওঁকে শোনাতে কিছু দিন দেরি হোল। এরপর থেকে অফিসের ছুটির পর ননীদার সঙ্গে নীরদ বাবু যদিও প্রায়ই আসতে লাগলেন, আমার ঘরের দিকে ঘেঁষলেন না। আসর জমল বউদির ঘরে, চা চলে, গল্প গুজব চলে। বউদি খুঁটে খুঁটে জিজ্ঞেস করেন নীরদ বাবুর বাড়ির কথা, ছোট ছোট জবাব কানে আসে। দু একটি আঁচড়ের ছবি। পর্দার আড়ালে যেন দেখা যায় জন কয়েক অজনা মানুষের অস্পষ্ট আনাগোনা।

আভাস ইঙ্গিত ছেড়ে বউদি একদিন স্পষ্টই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলেন শুনেছি আপনার স্ত্রী নাকি অপূর্ব সুন্দরী?' ননীদা বললেন অর্থাৎ আপনার বন্ধুর স্ত্রীর চেয়েও বেশি সুন্দরী কিনা সেইটাই জিজ্ঞাস্য।'

বউদি মুখ লাল করে বললেন, 'অসভ্য। সেটা তোমার জিজ্ঞাস্য হতে পারে আমার নয়।'

আমি ছিলাম পাশে দাঁড়ান। নীরদ বাবু একবার আমার দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বউদিকে বললেন, 'না আপনাদের কারো মত নয়।'

এবার আরক্ত হওয়ার পালা আমার। কিন্তু রক্ষা, আমার মুখের

রঙ বদলানো কারো চোখে পড়ল না। কেউ চেয়ে থাকলেও কি পড়ত? আমার মুখের রঙ তো তেমন নয় যে একটু বদলালেই ধরা পড়বে। আঁধার মুখ আরো অন্ধকার করে পালিয়ে এলাম। বউদির সহানুভূতি কানে গেল, 'রূপ নেই বলে ভারি দুঃখ আমাদের মীরার।'

নীরদ বাবু বললেন, 'কিন্তু রূপই তো মানুষের একমাত্র সম্পদ নয়।' নিছক ভদ্রতা ছাড়া কি? এর মধ্যে নীরদ বাবু আমার আর কোন সম্পদের পরিচয় পেলেন? কিন্তু কোন সম্পদের পরিচয় কি ওঁকে কোন দিনই দিতে পারব না?

ঘরে এসে বই দিয়ে মুখ ঢাকলাম কিন্তু চোখের জল ঢাকতে পারলাম না।

হঠাৎ ননীদার সঙ্গে নীরদ বাবু ঘরে ঢুকলেন, বললেন, 'আপনি অমন করে চলে এলেন যে।'

বুঝলাম সহানুভূতির পালা এখনো শেষ হয়নি। চলেতো রোজই আসি। কিন্তু এর আগে কোন দিন তিনি কি সে কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছেন?

তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললাম, 'পড়ার চাপ পড়েছে।' নীরদ বাবু বললেন, 'কিন্তু পরীক্ষার তো আপনার ঢের দেরি।' বললাম, 'পরীক্ষার জন্যই যে পড়ি তা কেন ভাবছেন?'

তিনি বললেন, 'তবে?'

বললাম, 'পড়তে বেশ লাগে।'

নীরদ বাবু বইয়ের র‍্যাক গুলির দিকে একবার তাকালেন, বললেন 'তার পরিচয় পাচ্ছি। সে দিনই কেমন সন্দেহ হয়েছিল ননী মিথ্যা কথা বলছে। ভাষ্য তৈরী করবার অভ্যাস থাকলেও শুধু ভাষ্য পড়েই আপনি খুসি নন।'

বললাম, 'তা হয় তো নই। কিন্তু বই মাত্রেই তো ভাষ্য। মূল জীবনের সঙ্গে কি কোন কিছুরই তুলনা হয়?'

ননীদা পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। এ কথা আমার মুখ থেকে যেন তিনি আশা করেন নি। কিন্তু নীরদ বাবু রীতিমত চমকে

উঠলেন। আমি চমক লাগাতেই চেয়েছিলাম। আমার মুখে রূপ নেই, কিন্তু মুখের কথার রূপ যেন থাকে। সে রূপ বিদ্যুতের মত যেন শ্রোতার চোখকে ঝলসে দেয়। রূপকথার মত যেন ঘুম পাড়িয়ে রাখতে পারে।

এরপর নীরদ বাবু দিন কয়েক আমাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চললেন। বুঝলাম তিনি ভয় পেয়েছেন। না কি এ কেবল আমার অহংকার আর মিথ্যা আত্মপ্রসাদ? পুরুষের ভয় পাওয়ার মত সত্যিই কি কিছু আছে আমার মধ্যে? তিনি যে আমার দিকে সোজাসুজি তাকান না সে তাঁর সাহসের অভাবে না চোখ পীড়িত হবে সেই আশংকায়!

কিন্তু দিন কয়েক বাদে তিনি আবার এসে বললেন, 'ননীর কাছে শুনেছেন বোধ হয় বই আমারও খুব প্রিয় বস্তু, আমিও খুব ভালোবাসি পড়তে।'

বললাম, 'শুনেছি, কিন্তু আপনাকে বোধ হয় তিনি বলেন নি যে আমার ভালোবাসা আরো মারাত্মক।'

নীরদ বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কি রকম।'

হেসে বললাম, 'আমি কেবল বই ভক্ত নয়, বই ভক্তদেরও ভক্ত, তাঁদের সঙ্গে বিতর্কের সুযোগ পেলে সহজে ছাড়তে চাইনা।'

নীরদ বাবুর সুগৌর মুখে যেন সিঁদুরের ছোপ লাগল, চমৎকার লাগল দেখতে। আমার মনের অহংকার আরো বাড়ল, কারণ রঙ নীরদ বাবুরই, কিন্তু সিঁদুরটুকু আমার। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ও হোল একটু। বাড়াবাড়ি হোল না তো। কি ভাবলেন নীরদ বাবু। হয় তো অত্যন্ত নির্লজ্জ মনে করলেন আমাকে। কিন্তু নীরদ বাবু সেদিক দিয়েই গেলেন না, বললেন, 'কিন্তু আমি তো তর্ক করতে জানি না।'

হেসে বললাম, 'কি জানি সত্যি কথা বলছেন কিনা। বিনয় করতে কিন্তু ভয়ংকর জানেন। আমার ও ভূষণটি একেবারেই নেই।'

নীরদ বাবু আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, 'আপনার অন্য ভূষণ আছে।'

এবারও তাঁর কণ্ঠ বেদনার্তের মত শোনাল। স্বীকার করতে তিনি

এত কষ্ট পাচ্ছেন কেন? আমার সে ভূষণ কি এতই তীক্ষ্ণ যে তাঁর চোখে বিঁধেছে, বুকে বিঁধেছে?

প্রস্তাবটা বোধহয় ননীদাই প্রথম করেছিলেন, 'কেবল তর্ক না ক'রে পরীক্ষার বছরে নীরদের কাছে পড়াটা একটু দেখে শুনে নে, তাতে আখেরে কাজ হবে।'

নীরদবাবু বললেন, 'কিন্তু গুরুগিরিকে আমি অত্যন্ত ভয় করি।' ভয়টা যে কেবল গুরুগিরিকেই নয় সেটা তার বলবার ভঙ্গিতেই ধরা পড়ল।

মনে মনে হেসে বললাম 'কিন্তু পরীক্ষককে ভয় আমার তার চেয়েও বেশি। দেখেছেন তো এতদিন কেবল বাজে বই পড়েই সময় নষ্ট করেছি। এবার একটু যদি সাহায্য করেন চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।'

নীরদ বাবু রাজী হলেন। রাজী না হয়ে তিনি নিজেই কি পারতেন?

বউদিকে নিয়ে ননীদা সেদিন সিনেমায় গেছেন সন্ধ্যার শো-তে। সাধাসাধি আমাকেও বউদি করেছিলেন সঙ্গে নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি বলেছি, 'থাক, তাতে রসভঙ্গ হবে।'

বউদি হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুমি সত্যিই বেরসিক।' নিজের ঘরে যেতে যেতে হেসে বললাম, 'তা ঠিক। তোমাদের সিনেমার রস অন্তত আমার মগজে ঢোকেনা।'

বউদি বললেন, 'না ঢুকবারই কথা, বই পড়ে পড়ে তোমার মগজ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।'

মনে মনে বললাম, 'তুমি কিছু জানোনা বউদি, কাঠ যদি হতে পারতাম তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি।'

নীরদ বাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন' 'ওরা কোথায়?' বললাম 'সিনেমায় গেছেন।'

'আপনি যাননি যে?'

'তাহ'লে আপনি এসে ফিরে যেতেন।'

নীরদ বাবু বললেন, 'এখনো ফিরে যাব কিনা ভাবছি।'

একটু যেন কেঁপে উঠল তাঁর গলা, একি বুকের কম্পনেরই প্রতিধ্বনি ?

আমি কোন জবাব দিলাম না, কেবল চেয়ারটা এগিয়ে দিলাম।

নীরদ বাবু এসে ভিতরে বসলেন, ফিরে গেলেন না।

প্যালগেভের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ নীরদ বাবু বললেন, 'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়না বুদ্ধির আলাদা একটি রূপ আছে ?'

বললাম, 'কি জানি, যার রূপও নেই, বুদ্ধিও নেই, তার সে কথা জানবার কথা নয়।'

নীরদ বাবু বললেন, 'বিনয় ছাড়ুন। বিনয় আপনার জন্য নয়। রূপ না থাকলেও রূপের অতিরিক্ত কিছু যে একটা আপনার মধ্যে আছে তা শুধু আপনি যে জানেন তাই নয়, জানাতেও জানেন।'

জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

নীরদ বাবু আবার বললেন, 'দেখুন, প্রচলিত অর্থে রূপ আমি দেখেছি। দেখে দেখে চোখ যেন বড় বেশি অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে রূপ শিমুল পলাশের রূপ, কেবল চোখের সামনেই জ্বলে, মনের ভিতরে নয়।' বললাম, 'আপনার মুখে এমন কথা কোনদিন শুনিনি।'

নীরদ বাবু অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'বোধহয় এত কথাও নয়। মনে করুন, কথা আমি আড়ালে বসে বসে তৈরী করে এনেছি।' বললাম, 'তাই যদি হয়, সেই তৈরী করা কথার কি কোন দাম আছে ? কে এত, বোকা যে তা বিশ্বাস করবে ?'

নীরদ বাবু বললেন, 'কেন করবেন না ? কথা আপনি সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করেন আর আমার তৈরী করতে একটু সময় লাগে এই যা তফাৎ। বলতে একটু দেরি হয় বলেই কি আমি মিথ্যা বলি ?'

বললাম, 'সে কথা যাক, বুদ্ধির ও রূপের কথা কি বলছিলেন ?' নীরদ বাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয় বুদ্ধির একটি আলাদা রূপ আছে। বুদ্ধিদীপ্ত রূপ। রূপ পুড়ে ছাই হয়ে যায় কিন্তু দীপ্তি টুকু থাকে।'

তারপর আর একদিন সন্ধ্যায় শুনলাম সে দীপ্তি আমার মুখে

আছে। আছে যে একথা আমি জানতাম। কিন্তু জানা কথাও কোন কোন সময় অন্যের মুখ থেকে জানতে ভারি চমৎকার লাগে। নীরদ বাবু আরো বললেন বুদ্ধির যে রূপ তার সঙ্গে সাধারণ রূপের মিল নেই। তা একটু অন্য রকম হবেই। কারণ বুদ্ধির গতি প্রকৃতিই বাঁকা। খোঁচা লাগল মনে। দেখতে আমি কি সাধারণের চেয়েও খারাপ? কিন্তু খেদ বেশি দিন রইলনা। কথায় কথায় আঙ্গুল গুলি একদিন তিনি তাঁর সুন্দর মুঠির মধ্যে চেপে ধরলেন। আমি প্রথমে একটু চম্‌কে উঠলাম, চেষ্টা করলাম হাত ছাড়িয়ে নিতে, কিন্তু পারলাম না। মনে হতে লাগল শুধু আঙ্গুল গুলি কেন আমার সমস্ত সত্ত্বা যদি ওই মুঠির মধ্যে ভ'রে দিতে পারতাম তাহলে বুঝি কোন দুঃখ থাকতনা।

ক্রমে বাধা ঘুচতে লাগল। মনের বাধা যদি ঘোচে, বাইরের বাধায় কতক্ষণ বেঁধে রাখতে পারে? সুযোগ যখন জোটেনা তখন নিজেরা জুটে সুযোগ সৃষ্টি করি। আর কল্‌কাতা সহরে সিনেমা থিয়েটারের তো অভাব নেই। নতুন কোন বই এলেই বউকে নিয়ে ননীদার ছুটতে হয়। রাখতে হয় নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, মানতে হয় সামাজিকতার রীতি নীতি।

কিন্তু আমরা মানলামনা। আমরা তুচ্ছ করলাম সব অনুশাসন। ভাঙলাম সব বাধা, ছিঁড়লাম বিধি নিষেধ, ভাবলাম যে বাঁধনে নিজেরা জড়িয়েছি তাই কেবল অচ্ছেদ্য।

এখন মাঝে মাঝে ভাবি এতখানি সম্ভব হয়েছিল কি ক'রে। ওই রুচিশীল পুরুষটির মনে এমন উদগ্র অতৃপ্ত কামনা কোথায় বাসা বেঁধে ছিল। লুকিয়ে লাভ নেই, নিজের মনকে আঁখিঠারার অভ্যাস নেই আমার। ওঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই লোভ আমার উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ওঁর কাছ থেকে এত সহজে যে সারা আসবে এমন আশা ছিলনা। কি ছিল আমার মধ্যে, কি তিনি পেয়েছিলেন দেখতে? কেবল কি কথা! কথার দীপ্তি, কথার রঙ। সে কথা বুঝি শুধু দু'কানে শুনে তৃপ্তি নেই, সে কথা উচ্চারিত হ'তে না হ'তে ঠোঁট থেকে দুই ঠোঁটে

তাকে কেড়ে না নিতে পারলে বুঝি পুরুষের চলে না। কিন্তু কেবল কি কথাই আমি বলেছি, তার মধ্যে কি বেদনা ছিলনা, বাসনা ছিলনা, ভালবাসা ছিলনা, সমস্ত অন্তর কি সেই কথার আধারে পুরে দিইনি, ভরে দিইনি। সে অন্তর ছুঁতে হ'লে যে দেহকেই ছুতে হয় দেহকেই নিংড়ে নিতে হয়, যোগ্যতা অযোগ্যতার তখন কি কোন ব্যবধান থাকে?

একদিন বললাম, 'জন্মাবধি নিজের দেহকে মনে মনে ধিক্কার দিয়ে এসেছি। বলেছি, সুন্দরই যদি না গেল এই দেহের প্রয়োজন ছিল কি? এর চেয়ে নিরাবয়ব কতগুলি ধারণার পুঞ্জ ক'রে কেন বিধাতা আমাকে সৃষ্টি করলনা? তাহ'লে তো রূপহীনতার এমন লজ্জা আর গ্লানি আমাকে বয়ে বেড়াতে হোতনা। কিন্তু সে ক্ষোভ আজ আর আমার নেই। আজ এই দেহের জন্যও আমি গৌরব বোধ করছি। দেহ না থাকলে কি ক'রে চলত। তোমাকে এমন সম্পূর্ণ ক'রে পেতাম কি ক'রে?'

জবাবে তিনি আমাকে আরও নিবিড় ক'রে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। 'প্রথম প্রথম আমারও তাই ভয় হয়েছিল। কেবল একরাশ কথা, কেবল কতগুলি মত, কতগুলি ধারণা। তোমাকে বুঝি হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবেনা, পাওয়া যাবেনা হৃদয় দিয়ে। কিন্তু নিজের তুমি অমন ক'রে নিন্দা করতে পারবেনা। এখন আমার, এ দেহ আমার সম্পদ।'

চোখ বুজে চুপ ক'রে রইলাম। তাই হোক। আমার বলে' আলাদা যেন কিছু আর না থাকে। যেন নিঃশেষ হয়ে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গলে যাই, মিশে যাই তোমার মধ্যে, তোমার ওই অপূর্ব রূপময় দেহাধারের সঙ্গে।

মাসকয়েক পরে একদিন বউদি আমার চেহারা দেখে চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন 'একি করলে মীরা, এমন ক'রে কপাল পোড়ালে কেন?' হঠাৎ জবাব দিতে পারলামনা। ক্রমে ননীদাও শুনলেন। কয়েক ঘণ্টা রইলেন গম্ভীর মুখে। আমার সামনে এলেন না কিন্তু নিজের বন্ধুকে সামনে পেয়ে হঠাৎ বাঘের মত

থাবা দিয়ে ধরলেন তাঁর কাঁধ, 'Scoundrel, এর পরেও কি ভেবেছ তুমি ওকে বিয়ে না ক'রে পারবে?' বোধ হয় শারীরিক যন্ত্রণাতেই বিকৃত মুখে তিনি একটু হাসলেন, 'না তা আরকি পারি? কিন্তু তাতে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক তো আরও মধুর হওয়ার কথা।' ননীদা বিজাতীয় ঘৃণায় সরে দাঁড়ালেন।

পরদিন মানিকতলা স্পারের ছোট্ট একটা ফ্ল্যাটে আমরা উঠে এলাম। সাজালাম ঘর, দোরে জানালায় ঝুলিয়ে দিলাম নীল পর্দা। যেন সারা পৃথিবী সেই পর্দার আড়ালে পড়বে।

দিন কয়েক বাদে ভিড় ভাঙল। ঝড় থামল নিন্দা ভর্ৎসনার। নিঃশব্দ নীড়ে দুজনে বসলাম মুখোমুখি। কিন্তু দেখলাম তিনি আমাকে দেখছেন না, তাঁর চোখ অন্য দিকে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কি ভাবছ?'

তিনি বললেন, 'কিছু না।'

বললাম, 'লুকোচ্ছ কেন আমাকে, কেন অমন আড়ালে চলছ?'

তিনি এবার সোজাসুজি আমার দিকে তাকালেন, 'লুকোবার, আড়াল করবার যে কিছু আছে তা তো তুমি জেনেই এসেছ।'

বললাম, 'তা জানি। কিন্তু সে কথা কি অমন ক'রে বলবার দরকার ছিল?

তিনি বললেন, 'তুমিই তো বলালে।'

কথাটা ঠিক। এরপর আমি আর কিছু বললাম না।

তারপর ভাবলাম আমাকে তো এমন চুপ করে সরে থাকলে চলবে না, জোর ক'রে আঁকড়ে ধরতে হবে। কোন আড়াল আমি রাখতে দেবনা, ওঁর সমস্ত অতীতকে আমি অস্বীকার করব, মুছে ফেলব নিঃশেষে।

মন দিয়ে ঘরকন্না আরম্ভ করলাম! তাগিদে ফরমাসে ব্যস্ত ক'রে তুললাম ওঁকে। মাত্র কয়েকটা মাস, তারপরে সব ভুলবে, সব ভুলতে বাধ্য হবে।

ওঁর আত্মীয় স্বজনদের যাতায়াত যখন বন্ধ হোল, বেছে বেছে নিজের

বন্ধুদের ডেকে আনলাম। চারিদিক ঘিরে গড়ে উঠুক আমাদের আলাদা দল, আলাদা জগৎ। আমাদের একঘরে করে কার সাধ্য?

জানালার পর্দার রঙ বদলাই, আসবাব পত্র ওলট পালট করে রূপ বদলাই ঘরের। কোন দিন পাই পয়সার পর্যন্ত হিসাব করে করে লিখি জমা খরচ, তুচ্ছাতি তুচ্ছ ঘটনার বিবরণে ডায়েরীর পাতা ভরে তুলি, তারপর আবার ভুলি। আবার চলে বেহিসাবের পালা, দুইয়েতেই আনন্দ, হিসাবও ভালো বেহিসাবও। কি চমৎকার যে দুইই আছে, তাই তো কখনো এটা, কখনো ওটা যখন যাকে খুসি নিতে পারি ছাড়তে পারি। এত আনন্দ ঘর বেঁধে, সমস্ত সংসার যেন বাঁধা পড়েছে। টেবিল ঢাকনির চার কোণায় সবুজ সুতোর ফুল তুলি, পোড়মাটির ফুল দানির মধ্যে ভরি রজনীগন্ধার ঝাড়। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন, সমস্ত সাধ যেন মূর্তি ধরে উঠেছে। তাদের প্রত্যক্ষ করছি স্বামীর জন্য খাবার তৈরী করায়, তাঁর অফিসে বেরোবার আয়োজনে, তাঁর ঘরে ফিরবার মুহূর্তটির জন্য সারাদিনের প্রতি নিমেষের প্রতীক্ষায়।

কিন্তু আমি যেমন করে ধরা দিতে যাই, তাঁকে যেন তেমন ক'রে পাই না। কেবলই মনে হয় কোথায় যেন মিল নেই, কিসের একটা ব্যবধান যেন মাঝখানে খাড়া হয়ে আছে। কিন্তু ধারণাটীকে আমল না দিতে চেষ্টা করি। তিনি তো ভুলেও তার নাম করেন না। কোন প্রসঙ্গই তো ওঠেনা তার সম্বন্ধে। তবে কেন এই মিথ্যা ভয়, কেন মিথ্যা এক অশরীরী ছায়ার সঙ্গে অর্থহীন বিরোধ। আমি যেমন করে চলতে বলি তিনি তো তেমন করেই চলেন। হাসেন, গল্প করেন, সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন, আদর করেন, তবু কি যেন নেই, কি যেন থাকেনা। যেন একটি যন্ত্র, একটি পুতুল চারিদিকে নড়ে বেড়াচ্ছে। সে নিজে চলছেনা, কেউ যেন তাকে জোর করে চালিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবি তাই যদি হয়, তাতেই বা কি ক্ষতি? যদি কেউ ওঁকে বাইরে থেকে চালিয়েই থাকে সে তো আমিই, আর কেউ তো নয়।

একদিন ওঁর পায়ের ঠেলা লেগে নতুন কেনা চমৎকার চায়ের কাপটি ভেঙ্গে গেল। দু' একদিন বাদে অসাবধানে হাত থেকে পড়ল

আয়না খানা। ছিলাম রান্নাঘরে। ছুটে এসে দেখি কাঁচের টুকরোয় সমস্ত মেঝে ছেয়ে গেছে।

টুকরোগুলি কুড়িয়ে একখানা খবরের কাগজের ওপর জড়ো করতে করতে বললাম, 'এত অন্যমনস্ক কেন বলোতো, এই সেদিন চায়ের কাপ ভাঙলে, আজ ভাঙলে এমন সুন্দর আয়না খানা, রাতদিন কি এত ভাব, এত চিন্তা করো কিসের?'

তিনি অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'তোমার কি ধারণা বেশ ভেবে চিন্তেই তোমার সখের জিনিষ পত্রগুলি ভাঙছি?'

এ আবার কি কথা। সখ কি কেবল আমারই, ওঁর নয়?

রাগ ক'রে বললাম, 'সে কথা এক হিসাবে তো সত্যিই। জিনিষ পত্র গুলির ওপর তোমার দরদ অনেক কম।'

তিনি বললেন, 'তা ঠিক নয়। এসব তোমার কাছে যতটা নতুন আমার কাছে ততখানি নয়। তা ছাড়া গড়বার মত ভাঙবার অভ্যাসও যে আমার আছে তা তুমি জানো।'

তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলাম। তারপর হাসবার চেষ্টা ক'রে বললাম, 'তা জানি, কিন্তু আয়না আর চায়ের কাপ ভেঙে যে বার বার সে কথা তোমার মনে করিয়ে দেওয়ার দরকার হবে তা জানতাম না।'

কাঁচের টুকরো গুলি বাইরের ডাষ্টবিনে ফেলে দিয়ে এসে বললাম, 'তার চেয়ে স্পষ্ট করে বলনা কি তুমি চাও, কি তোমার মনের যথার্থ ইচ্ছা।'

তিনি বিরক্তির ভঙ্গিতে বললেন, 'চুপ করো। কথা বলতে পারো বলেই যে সব কথা তোমার মুখে সুন্দর শোনায় তা ভেবনা। আমার ভুল হয়েছিল। মুখরা মেয়ের মত তুমি কেবল কথা বলতেই জানো, থামতে জানোনা। ভাষার মত জীবনে আভাসেরও যে প্রয়োজন আছে একথা তোমার জানা নেই।'

বললাম 'তা হবে, তবু ভালো. নিজের ভুল এত তাড়াতাড়ি ধরতে পেরেছ এত সহজে।'

তাঁর সামনে থেকে উঠে গিয়ে জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। সামনের বাড়িটির দৈনন্দিন যাত্রা চলেছে। কে একটি বউ বারাণ্ডায় বঁটি পেতে তরকারি কুটছে। তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর কপালে সিঁদুরের কৌটা। মনে পড়ল এখানে এসে আমি সিঁদুর পরেছিলাম বলে স্বামী নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'ওসব থাক।'

'কেন।'

'ওসব পৌত্তলিকতার আর দরকার কি? বিশেষ ক'রে সিঁদুরটা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি।'

সিঁদুরের ওপর আমারও যে খুব পক্ষপাতিত্ব ছিল তা নয়। তাই স্বামীর অনুরোধ সহজেই রাখতে পেরেছিলাম। কিন্তু আজ ওই বউটির কপালে সিঁদুর দেখতে ভারি চমৎকার লাগল। সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর খানিক আগের কথাটি মনে পড়ে গেল। ভুল, তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেছেন তাঁর ভুল হয়েছে। কতখানি ভুল? এ ভুলের ভিত্তিমূল কতদূর পর্যন্ত গেছে!

তিনি এসে হাত রাখলেন কাঁধে, ডাকলেন, 'মীরা।'

মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলাম, 'বলো।'

তিনি শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, 'মাফ করো। আমি ভুল করেছিলাম।'

আবার সেই ভুলের কথা। এবার অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে বললাম, 'তা তো শুনলাম। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ বার বার মুখে শুধু সেই ভুলকে স্বীকার করলেই তার প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

আঘাতের উগ্রতায় তিনি মুহূর্তের জন্য কোন কথা বলতে পারলেন না। তারপর ম্লান হেসে বললেন, 'না তা হয়না। সে প্রায়শ্চিত্ত জীবনের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। তার জন্য হাসতে হয়, কথা বলতে হয়, ভাণ করতে হয় ঘর সংসারের, বেশ ধরতে হয় সুখী দম্পতির। প্রায়শ্চিত্ত কেবল মুখের কথায় চলে না মীরা।'

স্বামী আর সেখানে দাঁড়ালেন না।

কিন্তু আমি জানালার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম। এতটুকু নড়বার পর্যন্ত শক্তিও যেন আর নেই। এরপরও কি কিছু আর বাকি

রইল, কিছু অবশিষ্ট রইল জীবনের। এতদিন যা তিনি আভাসে ইঙ্গিতে বলেছেন আজ তা স্পষ্ট কথায় বললেন। আমার কাছে যা স্বপ্ন যা সাধ যা পরম আনন্দের ওঁর কাছে তা ভুলের প্রায়শ্চিত্ত মাত্র, আর কিছু নয়। এ কথা শুনবার পরেও আর কি বাকি রইল? কিন্তু বাকি আছে। জীবনের প্রয়োজন তো কেবল কথায় শেষ হয় না। রঙবাতির রঙটুকু মুহূর্তের মধ্যে জ্বলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু তার দগ্ধ শলাকাটা অবশিষ্ট থাকে। তার ক্ষয় নেই।

নিত্যদিনের মত আজও গৃহকর্মে হাত দিলাম। রান্না হোল, শেষ হোল স্বামীর অফিসের উদ্যোগে পর্ব। কিন্তু ঠিক যেন চলছি, যন্ত্রের পুতুলের মত। মন নেই, প্রাণ নেই ভিতরে। মানুষের পক্ষে যন্ত্র হওয়া যে কি দুঃসহ যন্ত্রণাকর তা আজ পলে পলে বুঝতে পারলাম। সঙ্গে সঙ্গে একধরণের সহানুভূতিও হোল স্বামীর ওপর। এ দুঃখ হয়তো তাঁর প্রথম দিন থেকেই সুরু হয়েছে।

সন্ধ্যার পর স্বামী হাসি মুখে ফিরলেন ঘরে। কিন্তু কারো হাসিকে আর কি সহজে বিশ্বাস করতে পারি? ফেরার পথে তিনি নতুন বই এনেছেন, এনেছেন ফুলের তোড়া।

বললেন, 'পড়াশুনোটা কি একেবারে ছেড়ে দিলে নাকি?'

'না, ছাড়ব কেন!'

তিনি বললেন, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। কিঞ্চিৎ পঠনং বিবাহস্য কারণম। কিন্তু অত সহজে আমি ছাড়ছিনা। এম-এ টা তোমাকে দিতেই হবে।'

বাবার স্নেহ আর আশ্বাসের কথা মনে পড়ল। হেসে বললাম, 'তাই না কি?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এ'কদিন আমার কাছেই বই পত্র নিয়ে বসো, তারপর সেসন আরম্ভ হলে ইউনিভার্সিটিতে যাবে। ততদিনে অবস্থাটাও আশা করি তোমার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে আসবে।'

স্বামী মৃদু একটু হাসলেন, আমিও মুখ নিচু ক'রে রইলাম। তারপর বললাম 'আচ্ছা।'

মনে মনে ভাবলাম বই-ই তো ছিল পূর্বরাগের মাধ্যম। দেখা যাক এর মধ্যস্থতায় সংশয়-সংকুল অনুরাগ ফের স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় কিনা।

পড়া শুনো আরম্ভ হোল। কিন্তু সময় বদলে গেছে, বদলে গেছে জীবনের স্বাদ। তখন অধ্যয়ন অধ্যাপনায় সম্পূর্ণ মন সংযোগ সম্ভব হয়নি। বইয়ের পাতার আড়ালে ছুজনে ছুজনকে দেখেছি, পাতা ওল্টাতে হাতে হাত ঠেকেছে, আঙুলে ছুঁয়ে গেছে আঙুল। আজ আর সেই লুকোচুরি উঞ্ছবৃত্তির প্রয়োজন নেই। দুরে তীরে বসে আজ এক ফোঁটা জলের জন্য কাঙালপনা করবার দরকার হয়না। অতল গভীর সমুদ্র রয়েছে সামনে। যে কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেই চলে। কিন্তু উৎসাহ কই, ঔৎসুক্য কই? এ যেন তীরে ঘেরা ছুই আলাদা লবণসমুদ্র। সেই তীরের বেড়া কে ভাঙবে? ভেঙে লাভই বা কি? কারো অন্তরের তৃষ্ণাই কি এই লোনাজলে মিটবে?

তবু পড়াটী যেমন করেই হোক এগুচ্ছিল। কিন্তু স্বামী একদিন বললেন, 'থাক, ভালো লাগছেনা।'

বললাম 'তোমার নাকি ছবি আঁকা অভ্যাস ছিল। দেখনা ফের তুলি আর রঙের বাটি নিয়ে বসে, ভালো লাগতেও পারে।'

স্বামী অদ্ভুত একটু হাসলেন, 'কেন নিজের ছবি আঁকাবার সখ হয়েছে নাকি।'

ননীদার কথা মনে পড়ল। তিনি একদিন বলেছিলেন সুন্দরী বউয়ের ছবি এঁকে এঁকে তাঁর বন্ধু ঘর ভরেছেন। খোঁচটি বুকের মধ্যে তীরের মত গিয়ে বিঁধল।

বললাম, 'না, কোত্থেকে হবে, ছবি আঁকাবার মত চেহারা তো আমার নেই। তার জন্য বরং সুরমাদিকেই তুমি আনিয়ে নাও।' স্বামী আমার দিকে ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, তাঁর ছুই চোখে যেন আগুন ঝরছে, বললেন, 'কিন্তু সে এলে কেবল ছবির মডেল হয়েই এখানে আসবেনা তা জানো তো?'

বলালম, 'জানি।'

তাঁর সামনেই ছু'চোখ ফেটে জল আসতে চাইল। কিন্তু প্রাণপণে

রোধ করলাম চোখের জল। কান্নার পালা আমার নয়। আমার কান্নায় লোকে হাসবে। চোখের জলে সবাইর যে মন গলাচ্ছে সেই গলাক। ও অস্ত্র আমি কেন ছোঁব?

পরদিন হাসপাতালে যেতে হোল। তারপর দিন পনের বাদে ফিরলাম ঘরে। ডাক্তারেরা বহু চেষ্টা করেও সন্তান রাখতে পারেননি। অতিকষ্টে নিজের প্রাণ রক্ষা হয়েছে।

স্বামী সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে বললেন, 'দুঃখ কোরোনা। ছেলে বাঁচাবার চেষ্টা করলে নিজে বাঁচতে পারতেনা।'

অতিকষ্টে একটু হাসলাম, 'নিজের জীবনের চেয়ে আর বড় কি আছে? কি ভাগ্য যে আমার প্রাণ বাঁচাবার কথাই তোমার মনে হয়েছে। না হলেও তো পারত।'

স্বামী কঠিন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বললাম, 'যাহোক এ দয়া চির জীবন মনে রাখব।'

বেশিদিন শুয়ে থাকতে হোলনা। দেহ তেমন সবল না হলেও মনের জোরে আর মনের জেদেই উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু সংসার আর দাঁড়াল না। রস নেই, রঙ নেই। সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটি শুকনো ছোবড়ার মত পড়ে আছে।

ঝগড়ার ভয়ে নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পারতপক্ষে কেউ কোন কথা বলিনা। কিন্তু কেবল কথা বন্ধ করেই কি ঝগড়া বন্ধ করা যায়? মনের হিংস্রতা প্রকাশের আরো পথ আছে। চোখে চোখ পড়লেই তা বুঝতে পারি। কিন্তু চোখও না ফিরিয়ে রাখা যায়, কেউ কারো দিকে না চাইলেই চলে। কিন্তু পরস্পরের এই নিঃশব্দ অস্তিত্ব? একে রোধ করি কি করে? কি ক'রে ঢেকে রাখি? একজনের অস্তিত্বই যেখানে আর একজনের কাছে challenge সেখানে বৈরিতার কি কোন বিরাম আছে, প্রতিমুহূর্তের সংঘাতে কোন সন্ধিকাল আছে কি?

একদিন তিনি বললেন, 'তোমার শরীর ক্রমেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। নিজের দিকে একবার ভালো ক'রে তাকালাম। তারপর সরে এলাম আয়নার কাছ থেকে।

তিনি বললেন, 'কি দেখছিলে।'

বললাম, 'দেখছিলাম. কেন আজকাল আমাকে ছুঁয়ে দেখবারও আর তোমার প্রবৃত্তি হয়না।'

তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'দোষটা তা হলে আমার প্রবৃত্তির নয় বুঝতে পারছ।'

বললাম, 'না বুঝে উপায় কি।'

তিনি এবার শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আমার মনে হয় তোমার এখন কিছুদিনের জন্য চেঞ্জের দরকার মীরা। দেহ মন দুইয়ের জন্যই।'

বললাম, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

সপ্তাহ খানেক বাদে চিঠি খানা দেখালাম স্বামীকে, Appointment Letter· রাজসাহীর একটি মফঃস্বল সহরে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারী, মাইনে ষাট টাকা। ফ্রী কোয়ার্টার আছে।

স্বামী বললেন, 'এযে দেখছি চেঞ্জের একেবারে পাকাপাকি বন্দোবস্ত। বিবাহ বিচ্ছেদ নাকি?

বললাম, 'বিয়ে কি কোন দিনই হয়েছিল?'

তিনি কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

অজ্ঞাত অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে সারারাত ঘুম হোলনা। একেকবার ভাবলাম স্বামী বাধা দেবেন. শেষ মুহূর্তে তিনি কিছুতেই আমাকে এমন করে যেতে দেবেন না। অনুশোচনা হোল কেন অতখানি রূঢ় হতে গেলাম, কেন অমন ক'রে আঘাত করলাম ওঁকে। বিছানা ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলাম ওঁর কাছে। ক্ষমা চাইব। আমার সমস্ত রূঢ়তা, রুক্ষতা. সমস্ত কাঠিণ্য ওঁর স্নেহের উত্তাপে অশ্রুতে চুম্বনে গলে গলে পড়বে।

কিন্তু ওঁর কাছে গিয়ে থমকে গেলাম। স্বামী ঘুমাচ্ছেন। জানালা দিয়ে জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ওঁর মুখে। কি গভীর প্রশান্ত ঘুম! আমার উদ্বেগ অনিদ্রা আমার যন্ত্রণার এতটুকু চিহ্নও সে মুখে নেই। এবং দীর্ঘদিন বাদে স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তিতে দুটি ঠোঁট যেন টলটল করছে। গভীর রাত্রে কতদিন এই সুন্দর নিদ্রিত মুখের দিকে চেয়ে রয়েছি, চুপে

চুপে আলগোছে চুম্বন করেছি ওই ঠোঁটে, কিন্তু আজ ওঁর এই নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক বিদ্বেষ আর ঘৃণায় আমার সমস্ত অন্তর ভরে উঠল, যেন আর একটি নারীর উপভোগের চিহ্ন এই মুখে ঠোঁটে লেগে রয়েছে। সেই কলঙ্কের দাগ যেন আজ আমার এই প্রথম চোখে পড়ল।

ছু' একজন বান্ধবীকে বললাম কথাটা ; আমার চাকুরি নিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার কথা। তারা বলল আরো ছু' চারজনকে। পরিচিত বন্ধুমহলে আর একবার আলোচনা সমালোচনার ঢেউ উঠল। কিন্তু এবারকার উপহাস পরিহাস সম্পূর্ণ আমার কানে এসে পৌছুঁতে পারলনা ; ট্রেণের শব্দে তার অনেক খানিই ঢাকা পড়ল।

মাস তিনেক পরে চিঠি লিখলেন রেবা বউদি। এতদিন ঠিকানা জানেননি বলেই লিখতে পারেননি। আর কাউকে না হোক তাঁকেতো অন্তত ঠিকানাটী দিয়ে আসতে পারতাম, তিনি অভিযোগ করেছেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় অভিযোগ, এমন বোকামি আমি কেন করতে গেলাম, এমন ক'রে ছেড়ে দিয়ে এলাম কেন সব। অধিকার একবার ছাড়লে আর কি তা ফিরে পাওয়া যায়? ছেলে নিয়ে সুরমা যে এবার আমার ঘর সংসার দখল করে বসল, আর কি সে কোন দিন সেখান থেকে নড়বে? এসব করবার আগে একবার যদি জিজ্ঞেস করতাম বউদিকে তাহলে নিশ্চয়ই তিনি সুপরামর্শ দিতে পারতেন।

সংবাদ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানালাম বউদিকে। আঘাত যে পেলাম তা অস্বীকার করবনা। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে একধরণের কৌতুকও বোধ করলাম। পুরুষের ঘর আর মন বুঝি মুহূর্তের জন্যও শূন্য থাকতে পারেনা। আমি চলে আসতে না আসতেই সুরমাকে ওঁর দরকার পড়েছে। নাকি সুরমাই চলে এসেছে খবর পেয়ে। এতদিন সামনা-সামনি এসে কেড়ে নেওয়ার সাহস হয়নি, এবার খালি ঘরে দখলী স্বত্বের সুযোগ পেয়েছে।

আরও বেশি ক'রে মন দিলাম মাস্টারীতে। মন দিতে চেষ্টা করলাম পড়াশুনোয়। যা তুচ্ছ ক'রে ছেড়ে এসেছি তার জন্য ক্ষোভ

করতে আমার অহংকারে বাধে। নিজের জেদ আমি অটুট রাখব। নিজের সম্মান নিজের কাছে আমি ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবনা।

কিন্তু বউদির চিঠি আসার বিরাম নেই। সুরমা নাকি এবার বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। একেবারে আঁচলে বেঁধে রেখেছে স্বামীকে। অফিস ছাড়া আর কোথাও বড় একটা তাঁকে দেখা যায়না। দিন রাত নাকি ঘরেই আটকে রাখে। চোখের আড়াল ক'রে একবার ঠকেছে সুরমা। দ্বিতীয়বার ঠকতে রাজী নয়। একদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে তার সঙ্গে বউদির দেখাও হয়ে গেছে। স্বামী আর ছেলের সঙ্গে সুরমাও সিনেমা দেখতে এসেছিল। একেবারে পাড়া গেঁয়ে ধরণ ধারণ। সাজ সজ্জা, গয়না গাঁটির প্যাটার্ণ অন্তত পক্ষে পঁচিশ বছরের পুরোন। তবে রূপ আছে তা স্বীকার করতে হয়। চমৎকার মানিয়েছিল তাকে স্বামীর পাশে। মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা পুরুষদের মুখে কিন্তু চোখ থাকে কেবল রূপের দিকে। খুব বেশি দূরে যেতে হয়নি, নিজের স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়েই এ সত্য নাকি বউদি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

ঈর্ষা আর ব্যর্থতার জ্বালা বুকের মধ্যে নতুন করে অনুভব করলাম। পূজার ছুটিটা ভেবেছিলাম পশ্চিমে কোথাও গিয়ে কাটাব। কিন্তু প্ল্যান পালটে ফেললাম। উঠলাম এসে বউদির এখানে। নিজের অস্তিত্বকে এমন ক'রে মুছে ফেললে চলবে না।

ননীদা আর বউদি দু'জনেই খুসী হলেন। এমন সুমতি যে আমার হবে তা নাকি তাঁদের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। আমার ঘরটি ননীদার বসবার ঘরে রূপান্তরিত হয়েছিল। সাজিয়ে গুজিয়ে বউদি আর একবার তার রূপ বদলালেন।

দু'দিন কাটল, চারদিন কাটল, কিন্তু মানিকতলা যেতে পা আর সরে না। বউদি বললেন, 'খবর দি নীরদবাবুকে, কিংবা একটা চিঠি লিখে দি।'

হেসে বললাম, 'অমন কাজও কোরোনা। চিঠি দিলে হয়তো উকিলের চিঠিই দিতে হবে।'

পরদিন ননীদা বেরিয়েছেন অফিসে। বউদি তাঁর অন্য এক বান্ধবীর সঙ্গে গেছেন ম্যাটিনি শোতে। বহু অনুনয় বিনয়ের পর তাঁর হাত এড়াতে পেরেছি। শুয়ে শুয়ে একখানা ইংরেজী উপন্যাসের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে কখন নিজের জীবনোপন্যাসে মন চলে গেছে। চিন্তা করছি ইতি-কর্ত্তব্যতা।

সদর দরজায় কড়া নড়ার শব্দে হঠাৎ চমক ভাঙল। উঠে এসে দোর খুলে দিলাম। বছর পাঁচ ছয়ের একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমারই বয়সী আর একটি বধূ দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছন থেকে তের চৌদ্দ বছরের আর একটি ছেলে বলল, 'আচ্ছা, আপনি এবার কথা বলুন মাসীমা, আমি একটু ঘুরে আসি। এক্ষুনি আসব বেশী দেরী হবেনা।'

ছেলেটি চলে গেলে তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'একতলার ভাড়াটেদের ছেলে। অনেক সাধ্য সাধনা ক'রে তবে সঙ্গে এনেছি। এই তো ননীবাবুর বাড়ি? সতেরর দুই নম্বর নয় এটা?'

বললাম, 'হ্যাঁ। কিন্তু তিনি তো অফিসে। তাঁর স্ত্রীও তো এখন বাড়ি নেই।'

তিনি বললেন, 'ও তাহ'লে আপনিই—তুমিই মীরা। আমি তোমার কাছেই এসেছি।'

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশু ইনি তোমার নতুন মা। প্রণাম করো।'

কিন্তু বিশু মায়ের কথা শুনবার কোন লক্ষণ দেখালনা, আমার দিকে একবার তাকিয়ে তাঁর পিছনে গিয়ে লুকাল। আমি মুহূর্তের জন্য সুরমার দিকে একবার তাকালাম। বেশবাসের কোন বাহুল্য নেই: চওড়া লাল পেড়ে একখানা শাড়ি পরণে। সুডৌল সুগৌর মুখের চারদিকে পাড়টি চমৎকার মানিয়েছে। সিঁথিতে চওড়া সিঁদুরের দাগ, কপালে বড় একটি সিঁদুরের ফোঁটা; হাতে কয়েক গাছা ক'রে চুড়ি ছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

বললাম, হ্যাঁ, 'আমিই মীরা, আসুন!'

ছেলে নিয়ে সুরমা আমার পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল। ঘরে গিয়ে চেয়ারটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম 'বসুন'। সুরমা লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল, 'আবার চেয়ার কেন ভাই? আমরা কি চেয়ারের যোগ্য। মেঝেয় একটা মাদুর পেতে দিলেই হোত।'

বললাম 'মাদুরটা যেন কোথায় রয়েছে। চেয়ারেই বসুন না।'

সুরমা চেয়ারটা টেনে তাতে বসে বলল, 'তা না হয় বসলামই, আর তো কেউ নেই এখানে। তোমার কাছে আর লজ্জা কি? কিন্তু এই চেয়ারে বসা নিয়ে সেদিন কি কাণ্ড হয়ে গেছে শুনবে?'

কাণ্ড সম্বন্ধে আমার কোন কৌতূহল ছিল না, কিন্তু কৌতূক বোধ করে বললাম, 'বলুন।'

সুরমা বলল, 'ওঁর হুকুম, ওঁর সামনে চেয়ারে বসে আমাকে এই বয়সে ঘড়ি ধরে ইংরেজী শিখতে হবে। বলোতো ভাই, দুষ্ট ছেলেকে অষ্টক্ষণ আগলাব, ঘর-সংসার দেখব, আবার ইংরেজী অঙ্কও শিখব, এত আবদার সইতে কি একজন মানুষ পারে?'

বললাম, 'তাতো ঠিকই'। সুরমা বলল, 'কাজকর্ম সেরে শুয়ে শুয়ে দু একখানা নাটক নভেল পড়তে মন্দ লাগে না। কিন্তু ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিঠ খাড়া করে কি অমন ঠায় বসে থাকা যায়? তুমিই বলো। তা ছাড়া ওঁর সামনে চেয়ারে বসতে গেলে বলব কি ভাই, আমার ভারি হাসি পায়। কিন্তু আমার মুখে হাসি দেখলে যেন ওঁর মাথায় খুন চাপে। আগে তো কই এমন ছিলেন না। তুমি বুঝি কোনো দিন ওর সামনে হাসোনি?'

কৌতূক বোধের কিছুমাত্র আর আমার অবশিষ্ট ছিল না।

বললাম, 'না, হাসলে তো আপনার মত আমাকে সুন্দর দেখায় না।'

সুরমার মুখে যেন কিসের ম্লান ছায়া পড়ল, 'ছাই সুন্দর।'

তারপর আমার মুখের দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে সুরমা বলল, 'তোমার কথা কিন্তু ভাই মানতে পারলাম না, হাসলে সবাইকেই সুন্দর দেখায়।'

বললাম, 'আচ্ছা, আয়নার সামনে একদিন হেসে দেখব আপনার কথা সত্যি কিনা।'

সুরমা এবার হেসে যেন লুটিয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল, 'কথা শোন, আয়নার কি চোখ আছে না কি যে তার সামনে হাসবে?'

বললাম, 'ও নেই বুঝি, সেকথা আমার মনে ছিল না।'

মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই তো, শূন্য আয়নার কি কোন চোখ থাকে না রূপ থাকে, যদি কারো ছায়া তাতে না পড়ে, যদি কেউ তার মনের সামনে এসে না দাঁড়ায়।

আমার দিকে তাকিয়ে সুরমাও যেন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল, একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এখন বুঝতে পাচ্ছি কেন তোমাদের অত মনের মিল হয়েছিল।'

চমকে উঠে বললাম, 'কেন বলুন তো।'

সুরমা বলল, 'তোমরা দুজনেই সমান অবুঝ। তোমাদের বিদ্যা আছে কিন্তু বুদ্ধি নেই, ঠিক একেবারে আমার মেজ কাকার মত। বেশী পড়াশুনো করলে অমনই হয়। কাণ্ডজ্ঞান বেশী থাকে না।'

চুপ ক'রে রইলাম। সুরমার কথার কি জবাব দেব হঠাৎ ভেবে পেলাম না। সুরমা বলল, 'কিন্তু এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন উনি আগে কিন্তু ছিলেন না। এতখানি মাথা খারাপের ভাব ওর এর আগে কখনও দেখিনি। আমি স্পষ্টই বলব, রাগ করো না, এ ভাই তোমার দোষ।'

বললাম, 'কেন, মাথা খারাপের কি দেখলেন?'

সুরমা বলল, 'মাথা খারাপ ছাড়া কি? ঘর করবে একজনকে নিয়ে আর সারাক্ষণ ভাববে অন্যজনের কথা। একি ভাই পুরুষ মানুষের কাজ? নাটক নভেলে দেখেছি আমাদের মত অসহায় মেয়ে মানুষই ও রকম মাঝে মাঝে করে। নিজেদের মন তারা বুঝতে পারে না, যদি বা পারে লোক-নিন্দার ভয়ে মনের মত কাজ তারা করতে পারে না। কিন্তু পুরুষের তো সে ভয় নেই। না বুদ্ধির কিছু অভাব আছে তাদের, যে তারা এমন হবে?'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'কিন্তু অন্য জনের কথা ভাবে একথা কি করে বুঝলেন?'

সুরমা ম্লান একটু হাসল, 'বুঝি ভাই বুঝি। তুমি জানো মানুষটিকে তিন বছর ধরে, আর আমার এই ন বছর হোল। তোমার চেয়ে তিনগুণ বেশি চিনি। মুখ দেখলেই বুঝি, চোখ দেখলেই বুঝি, কথার ধরণ দেখলেই বুঝি, সে কার কথা ভাবে। আর এই বুঝতে পারায় যে কি কষ্ট, তা তুমি মেয়ে মানুষ, তোমার একেবারে না বুঝতে পারার কথা নয়।'

সুরমার কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। এ যেন সেই সুরমা নয়, যে মিনিট কয়েক আগে চেয়ার থেকে হাসতে হাসতে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ছিল। এ সুরমা অন্য একজন। একে আমি বিশেষ ক'রেই চিনি, যেমন চিনি নিজেকে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি একটু দেখল সুরমা, তারপর আবার বলতে লাগল, 'প্রথম প্রথম রাগে আর হিংসায় আমার বুক জ্বলে যেত। মনে হোত এর চেয়ে শ্বশুর ভাসুরের কাছেই ভালো ছিলাম, বেশ ভুলে ছিলাম, সেখানে। চিঠি লিখে ফের তাঁদের কাছে গিয়েই উঠি, না হয় চলে যাই বাবার কাছে। তারপর ভাবলাম, রাগারাগি ক'রে তোমার মত আমিও যদি চলে যাই, এই মানুষের উপায় হবে কি? তখন থেকে তোমাকে খুঁজছি। তারপর ওঁর অফিসের এক বন্ধুর মুখে শুনলাম তুমি এসেছ, তিনি নিজের চোখে তোমাকে এখানে দেখে গেছেন। ঠিকানা পেয়েই ছুটে এসেছি তোমার কাছে।'

মৃদুকণ্ঠে বললাম, 'আমার কাছে? আমি কি করব।'

সুরমা অপূর্ব ভঙ্গিতে একটু হাসল, সে হাসির সঙ্গে কান্নার কোথায় যেন মিল আছে। সুরমা বলল, 'কি আর করবে! পাগল নিয়ে ঘর করার চেয়ে সতীন নিয়ে ঘর করা অনেক ভালো।'

'আপনার হলো মাসীমা?' নিচ থেকে সেই ছেলেটির গলা শোনা গেল।

সুরমা উঠে গিয়ে জানালার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'হ্যাঁ হয়েছে। যাচ্ছি বাসু, চল মীরা।'

বিশু ততক্ষণে দোয়াতের সবটুকু কালি আমার সেই ইংরেজী উপন্যাসটার ওপর ঢেলে ফেলে অত্যন্ত অপ্রতিভ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে।

সুরমা ছেলের কাণ্ড দেখে ধমকে উঠল। 'দেখ দেখ কীর্তি দেখ ছেলের!'

অভিমানে বিশুর দুটি ঠোঁট ফুলে উঠল। তার সেই স্ফুরিত ঠোঁটে সস্নেহে চুমু খেয়ে সুরমার দিকে চেয়ে বললাম, 'আজ কি করে যাই দিদি? ননীদারা কেউ তো বাড়ী নেই।

সুরমা বলল, 'বেশ আমি অপেক্ষা করছি, ওঁরা আসুন।'

বললাম, 'না দিদি, আপনি ছেলে নিয়ে বাড়ী যান। ওঁদের কারো একজনের সঙ্গে আমি বরং কাল—'

সুরমা হেসে বলল, 'ঈস্, তুমি আমার মত গাঁয়ের পর্দ্দানশীন মেয়ে কিনা যে সব সময় তোমার একজন সঙ্গী দরকার হবে!'

'রাত ভোর হতে না হতেই কাল কিন্তু তাহলে অবশ্যই আসবে। কথা ঠিক থাকে যেন।'

হেসে ঘাড় নাড়লাম, 'থাকবে দিদি।'

কথা কিন্তু ঠিক রাখতে পারিনি। ভোর হতে না হতেই পশ্চিমের একখানা গাড়িতে উঠে বসেছি। আমার এই আকস্মিক ভ্রমণবিলাসে ননীদারা অত্যন্ত গাল মন্দ করেছেন। শেষে বলেছেন, 'না হয় দিন কয়েক দেরী করেই যা। আট দশ দিন বাদে আমরাও তো বেরোব। আমাদের সঙ্গেও যেতে পারবি।' হেসে জবাব দিয়েছি, 'দরকার কি? আমি তো আর পর্দ্দানশীন মেয়ে নই যে সব সময় যেমন তেমন সঙ্গী একজন চাই।'